বঙ্গীয় নাট্যশালা

গিরীশ যুগের নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কিত
একটি নির্ভরযোগ্য দলিল।

সেকালের নাট্যচর্চা

২

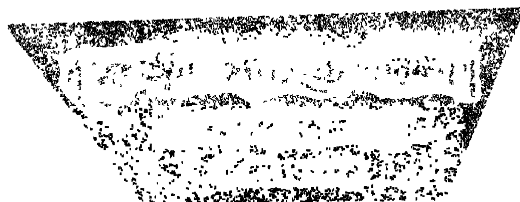
ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় কৃত

বঙ্গীয় নাট্যশালা

সম্পাদনা

ডঃ [illegible] গুপ্ত [illegible]
[illegible]

ডঃ [illegible]



প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৪৮

মীরা দত্ত ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক নিউ মানস প্রিন্টিং, ১/বি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

চন্দনার স্মৃতির উদ্দেশে—

দাদা

বিষ্ণু বসু

১। মুখবন্ধ

॥ এক ॥

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের নাট্যশালা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ ১৯০৩ সালে "রঙ্গভূমি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ১৯০৬ সালে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ "বীণা" পত্রিকায় বেরোয়। তিনবছর পরে প্রবন্ধগুলি কিছু সংশোধন করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়।

লেখক নাট্যপ্রযোজনার প্রায় সবকটি দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নাট্য-নির্বাচন, দর্শকরুচি, অভিনয়, পোষাক, দৃশ্যপট, গান-নাচের ব্যবহার নিয়ে এমন তীক্ষ্ণভাবে বিচার-বিবেচনা সমকালে আর চোখে পড়ে না। বলা চলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশ-পনর বছর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয় বছরের বাংলা নাট্যশালার বাস্তব অবস্থার ছবিটি এখানে ধরা পড়েছে। এই সময়কার নাট্য-প্রযোজনা, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে সমকালে কোনো কোনো সংবাদপত্র বা ব্যক্তিবিশেষ যে সব মামুলি মন্তব্য বা সোচ্ছ্বাস প্রশংসা করত তার যথার্থ বিচার করার সুযোগ করে দিয়েছেন এই অজ্ঞাত-পরিচয় লেখক।

এই অতি মূল্যবান বইটির লেখক কে তা নিয়ে ভাবনা আছে। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এই নামটিকে অনেকে ছদ্মনাম বলে মনে করতে চান। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী এই পুস্তকের লেখক এরূপ মত অনেকে মানেন। কিন্তু সে বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য, তার পক্ষে-বিপক্ষে কতটা যুক্তি আছে তলিয়ে দেখা যাক।

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আসলে ব্যোমকেশ মুস্তফীর ছদ্মনাম—এই তথ্যের পক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থিত করা চলে।

এক. ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতো খ্যাতনামা লেখক ভিন্ন নামে প্রবন্ধটি লিখবেন কেন, তার আরও অনেক লেখা নিজের নামেই বেরিয়েছিল। ধনঞ্জয়

মুখোপাধ্যায় নামেই কেউ এই প্রবন্ধগুলি লিখে থাকবেন। —এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে দুটি কথা আছে। প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে। তাদের রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে বেশ কটু মন্তব্য করা হয়েছে। তারা অনেকেই ব্যোমকেশবাবুর পরিচিতও ছিলেন। সেজন্য ছদ্মনামের অন্তরাল গ্রহণ করা অযৌক্তিক নয়। -আর ধনঞ্জয় নামক অপরিচিত লেখক, যিনি আর কিছুই লেখেন নি, তাঁর সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ গরজ করে বই করে ছাপবার আগ্রহ কোনো প্রকাশকের হবার কথা নয় এবং অনুরূপ লেখকের এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ ও সমলোচনা শক্তির কথা অবিশ্বাস্যপ্রায়। অভিনয়, সাজপোষাক, সাহিত্য, গান-নাচ, মঞ্চসজ্জা—সব কটি ব্যাপারে জ্ঞান, একজন অপরিচিত ধনঞ্জয় কোথায় পাবেন ?

দুই. এই বইয়ের লেখক অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা গ্রন্থমধ্যে বার বার প্রকাশ করেছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়-শিক্ষা-প্রণালীর গুণকীর্তন করা হয়েছে। পিতার প্রতি ব্যোমকেশ মুস্তফীর এ জাতীয় শ্রদ্ধাপ্রকাশ সঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু আলোচ্য রচনাটির মধ্যে একাধিকবার অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতি কটাক্ষও করা হয়েছে। তা কি করে সম্ভব হলো ?

তিন. ব্যোমকেশ মুস্তফীর নামে প্রকাশিত রচনাবলীর তুলনায় বর্তমান গ্রন্থটির মধ্যে চিন্তার ও পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা এবং সমগ্রতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ জাতীয় সাবজেকৃটিভ্ লক্ষণের উপরে খুব বেশি নির্ভর করা চলে না।

চার. ১৩১৯ বঙ্গাব্দে "বিশেষজ্ঞ" (অর্থাৎ কিরণচন্দ্র দত্ত) "নাট্যমন্দির" পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছেন "বঙ্গীয় নাট্যশালা" গ্রন্থের লেখক ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ব্যোমকেশ মুস্তফী ছাড়া আর কেউ-ই নন। তবে উক্ত বিশেষজ্ঞ নাট্যপ্রসঙ্গে ব্যোমকেশ-মহেন্দ্রনাথদের বিরুদ্ধপক্ষের লোক ছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় কি ? ব্যোমকেশবাবু অর্দ্ধেন্দু-পক্ষভুক্ত, সুতরাং গিরিশ-বিরোধী, নাট্যশালা-বিষয়ক তাঁর সমালোচনা নিরপেক্ষ নয়—এরূপ কথাই বিশেষজ্ঞ মহাশয় বলতে চেয়েছিলেন।

পাঁচ. বর্তমান পুস্তকের প্রকাশক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ব্যোমকেশ বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আবার বইয়ের পাদটীকায় নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে তাও ব্যোমকেশ বাবুর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য এরূপ প্রমাণের সাহায্যে কিছুই স্থির করা সম্ভব নয় ; নলিনী বাবু-নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার অধিকার ব্যোমকেশ বাবুর একচেটিয়া ছিল না।

ছয়. ব্যোমকেশ বাবুর যে সব প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল (সাহিত্যসাধকচরিতমালার অন্তর্গত দেবজ্যোতি দাশের লেখা বই দ্রষ্টব্য) তাতে নাট্য বিষয়ক বেশ কয়েকটি রচনা আছে। "দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা", "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" (দুটি প্রবন্ধ), "তেইশশত বর্ষের প্রাচীন নাট্যশালা আবিষ্কার", "একখানি বিস্মৃত নাটক", "নাট্যকার গিরিশচন্দ্র", "আবৃত্তির উপযোগিতা", "বাঙ্গলার প্রাচীন আবৃত্তি প্রথা", "এ দেশের নট-জীবন" ; তাছাড়া সম্ভবত "বিশ্বকোষ" ষোড়শখণ্ডে প্রকাশিত "রঙ্গালয়" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধেরও উল্লেখ করা চলে। বিশেষ করে অভিনয় আবৃত্তি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণাও তাঁর ছিল। এই তথ্যগুলি গ্রন্থটির লেখক হিসাবে তাঁর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

সাত. "বিশ্বকোষের" প্রবন্ধ ব্যোমকেশ মুস্তফীর লেখা—স্বয়ং সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু নাকি এ কথা বলেছিলেন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের "গিরিশচন্দ্র" বইয়ে এ তথ্য পাওয়া যায়। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে পূর্বোক্ত "বিশেষজ্ঞ" কিরণচন্দ্র দত্ত "নাট্যমন্দির" পত্রিকায় প্রথম এ কথা বলেন। যদি তা-ই হয় তবে "বঙ্গীয় নাট্যশালা"ও ব্যোমকেশবাবুর লেখা হওয়া সম্ভব। কারণ "রঙ্গালয়" প্রবন্ধের শেষ দিকে বলা হয়েছে।

"......এই সকল নাট্যশালা দ্বারা বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আজিও নাট্যশালার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সময় ও বিষয়োচিত বেশভূষার পারিপাট্য হয় নাই, ইংরেজীতে যাহাকে মেক্ আপ (Make up) বলে তাহার কিছুই নাই। দৃশ্যপটাদির উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও

তাহার মধ্যে সুসঙ্গতি আসে নাই। প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখাইতে, দৃশ্য যোজনার কৌশল সম্পাদন করিতে, দৃষ্টিবিভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদনের জন্য নানারূপ যন্ত্র সাহায্য ও বৈজ্ঞানিক ব্যপারের অনুষ্ঠান হইতেছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের নাট্যশালার তুলনায় সে সকল বিষয়ে বাঙ্গলার নাট্যশালা বহু পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা ত্রুটি লক্ষিত হয় অভিনয় কলায়। এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটি রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে। একটিকে গিরিশবাবুর স্কুল অর্থাৎ রীতি ও অপরটিকে মুস্তফীর (অর্দ্ধেন্দু বাবুর) স্কুল বা রীতি বলে। গিরিশবাবুর রীতিতে কি পদ্য অভিনয়ে কি গদ্য অভিনয়ে অভিনেতারা যেন একটা কবিতার সুর ধরিয়া শ্রোত্রসুখকর উপায়ে অভিনয় করিতে থাকে। ইহাতে স্বরের উন্নয়ন ও অবনয়ন অতি দ্রুত নিষ্পন্ন হয়। মুস্তফীর রীতিতে কি গদ্য কি পদ্য কথোপকথনের সুরে অভিনীত হয়, কেহ কোনরূপ নকল সুর অবলম্বন করিয়া আবৃত্তি করে না। ইহাতে আবৃত্তি গুণে শোত্রসুখকর করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষা বক্তব্য বিষয়ের ভাবের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। গিরিশবাবুর রীতি আজকাল বহু বিস্তৃত। মুস্তফীর রীতি তত বিস্তৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। ·· গিরিশবাবুর রীতি সহজে অভ্যস্ত হয় বলিয়া অল্পবিদ্যা অভিনেতার সংখ্যা আজকাল অনেক বেশী। পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা আজকাল স্ত্রী অভিনেত্রীরা বেশী উন্নতি-প্রয়াসিনী ও শিক্ষা-প্রিয়া হইয়া থাকে।" ['বিশ্বকোষ' ১৬শ খণ্ড, ১৩১২]

"বঙ্গীয় নাট্যশালা" গ্রন্থের লেখক পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিকেই সমকালীন মঞ্চাভিনয় থেকে নানা তথ্যের উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু-স্কুল এবং গিরিশ-স্কুল সম্বন্ধেও দুটি রচনায় হুবহু এক কথা বলা হয়েছে। সন্দেহ নেই "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" এবং "বঙ্গীয় নাট্যশালা" একই ব্যক্তির লেখা। কিন্তু প্রথমোক্তটি ব্যোমকেশবাবুর রচনা এ বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত দুই লেখকের সাক্ষ্য (নগেন্দ্রনাথ বসুর কথা অবিনাশ বাবু উদ্ধৃত করেছেন বহু কাল পরে) পর্যাপ্ত নয়।

"বঙ্গীয় নাট্যশালা" ব্যোমকেশ মুস্তফীর লেখা হওয়া সম্ভব, যদিও আমরা সে বিষয়ে একশ ভাগ নিশ্চিত নই। কিন্তু বিশ্বকোষে প্রকাশিত প্রবন্ধের চেয়ে এটি অনেক উচ্চস্তরের লেখা। সেখানে তথ্যালোচনার প্রাধান্য। বিভ্রান্তিও এসেছে সেই সূত্রে। এখানে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই লক্ষ্য। পক্ষপাতিত্বের অজুহাতে সত্যকে এড়ানো যাবে না। যদি ব্যোমকেশই এর লেখক হন, তিনি অর্দ্ধেন্দুকেও সমালোচনা থেকে রেহাই দেন নি। যাঁর লেখা হোক, লেখাটি খুব মূল্যবান। তাই এ বিষয়ে আমরা বিশেষ আগ্রহী।

॥ দুই ॥

পুস্তকের আখ্যাপত্র, উৎসর্গ-পত্র, সূচীপত্র প্রভৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হল—

আখ্যাপত্র : প্রথম পৃষ্ঠা

বঙ্গীয় নাট্যশালা | (সমালোচনা) | ("বাণী ও রঙ্গভূমি" হইতে পুনর্মুদ্রিত ও পরিবর্দ্ধিত) | শ্রীধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় |

আখ্যাপত্র : দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ, | এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, | ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা | প্রকাশক—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, | ৪৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট কলিকাতা |

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহাদের রুচি, প্রয়োজন ও তৃপ্তির দোহাই দিয়া। আধুনিক বঙ্গীয় নাট্যশালাগুলিতে। নানাবিধ কুপ্রথার। প্রচলন সমর্থিত হইয়া থাকে, সেই। নাট্যমোদী ও নাট্যপ্রিয় দর্শকবৃন্দের। উদ্বোধনার্থ। এই প্রবন্ধ কয়টি তাঁহাদিগকেই উপহৃত হইল।

সূচীপত্র।

লেখক-কৃত অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

অবতরণিকা

জ্ঞান হওয়া অবধি অনেক বাঙালা নাটক পড়িয়াছি আর অনেক নাটকের অভিনয়ও দেখিয়াছি। ইহা হইতেই বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, 'বাণী' সম্পাদকের আগ্রহে, তাহাই প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছিলাম। ইহার কয়েকটি ১৩১০ সালে "রঙ্গভূমি" নামক সাপ্তাহিক পত্রে এবং কতকগুলি ১৩১৩ সালে 'বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েকটি অভিনেতা বন্ধুর আগ্রহে আজ আবার সেগুলিই একটু সংশোধন করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইলাম। বন্ধুরা বলেন,—এ প্রবন্ধগুলিতে বঙ্গীয় নাট্যশালার ও বাঙ্গালী অভিনেতৃবর্গের অনেক উপকার হইবে। —ভাল কথা, বন্ধুদের আশা সফল হয়, বড় ভাল। আমার পরিশ্রমের অনেক বেশী পুরস্কার লাভ হইবে; আর যদি তাহা নাও হয়, তবু দুঃখ করিবার কিছু থাকিবে না, কারণ আমি জানি, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার হইতেই পারে না। উহা সমাজের তৃপ্তি-বিরক্তি ও প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমাজ যদি তাহার সংস্কারকল্পে একবাক্যে চেষ্টা না করে, ব্যক্তিগত চেষ্টায় তাহার সংস্কার অসম্ভব। আমার যাহা আশা তাহা নাট্যশালার বা অভিনেতৃবর্গের সংস্কার নহে; তাহা স্বতন্ত্র,—তাহা নাট্যমোদী নাট্যপ্রিয় জনসাধারণের হাতে।

বর্তমান গ্রন্থে বঙ্গীয় নাট্যশালার যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইল, সেগুলি এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল দোষপূর্ণ নাট্যশালাগুলিকে আজ পঞ্চাশদ্বর্ষকাল সমাজ সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে এবং ইহার গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিতেছে। এখন ইহাদের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমাজের একদেশে এমনও জল্পনা-কল্পনা উঠিয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় বঙ্গীয়-নাট্যশালাগুলি রাখা যায় কি না বা এগুলিকে পরিপোষণ করা উচিত কি না ?

এরূপ স্থলে সমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন। বঙ্গীয়-নাট্যশালার রহস্যগুলি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিলাম। যাঁহারা দর্শক, এতদ্দ্বারা তাহাদের যদি সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক হইবে। নাট্যশালাগুলিতে এখন সাজ-পোষাকের চটকে, দৃশ্যপটের চমকে, নাচগানের ধমকে আর বক্তৃতা-বাচালতা-ভাঁড়ামীর ঝলকে দর্শকের নয়ন-মন উপসর্গযোগে খাদ্যার্থের ন্যায় বলে অন্যত্র নীত হয়, কাজেই ইহার অভ্যন্তরে শত শত দোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। দর্শকগণ যদি এখন হইতে চক্ষু চাহিয়া সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেশের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যকলার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই এতদিনের সঙ্গীতকলার এত বড় প্রবল প্রতিষ্ঠানকে সমাজ বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিবেই। বঙ্গীয় নাট্যশালাগুলি দর্শকের মুখ চাহিয়া, দর্শকের

---

* "ঢাকার রঙ্গালয়" নামক একটি প্রবন্ধে ২০ আষাঢ়ের "ঢাকা প্রকাশে" শ্রীযুক্ত যদুনাথ লাহিড়ী মহাশয় ঢাকার রঙ্গালয় দুইটির অবস্থার সমালোচনা করেন। "ঢাকা প্রকাশ"সম্পাদক- সেই প্রবন্ধের উপর মন্তব্য লিখিতে গিয়া বলেন,—যাহাদের ধ্বংসই প্রার্থনীয় তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনাই বা কেন, আর তাহাদের সংস্কার চেষ্টাই বা কেন ?

—ঢাকাপ্রকাশ ২০ আষাঢ় ১৩১৬

ভরসা পাইয়াই উদ্দামগতিতে একরোখে অবনতির দিকে চলিয়াছে। সংবাদ-পত্রাদির সমালোচনায় তাহারা আর ভ্রূক্ষেপও করে না। সংবাদপত্রও আর তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। সাহিত্যক্ষেত্রের এই নীরব বিবাদ যাহাতে মিটিয়া যায়, তাহার জন্যই আজ এই প্রবন্ধ কয়টি জনসমাজে প্রচারিত হইল। এই জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় দর্শকগণের চক্ষুরুন্মীলিত হইলে শ্রম সফল হইবে।

সাধারণে বিশেষতঃ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ আমার এই সকল প্রস্তাবে আমাকে 'একদেশদর্শী', 'বিদ্রোহ-উত্তেজনাকারী' প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে পারেন ; কিন্তু তাহার পূর্বে ধীরভাবে এই প্রবন্ধ কয়টা পড়িবেন। তাহার পরও যদি কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করেন, বলিবেন, মাথা পাতিয়া লইব।

অবশেষে একটা কথা, —প্রবন্ধগুলি প্রথম যখন প্রকাশিত হয়, তখন নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর কর্মক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন। ১৩১৫ সালের ৩১শে ভাদ্র তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। নাট্যশালার ইতিহাসে সে একটি বিশেষ দুর্দিনে গিয়াছে। আমরা যে সকল সংস্কার প্রার্থী, তাঁহার অভাবে কে এখন সেগুলি করিতে সক্ষম হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। যাহা হউক এই গ্রন্থের রচনকালের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, প্রবন্ধগুলিতে তাহার নাম "শ্রীহীন" করিলাম না, নিবেদন ইতি।

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ ১৩১৬

শ্রীধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

এর পরে মূলগ্রন্থটি মুদ্রিত হচ্ছে। সমকালীন নাটক, নাট্যকার, অভিনেতা ও অন্যান্য কলকুশলীদের সম্পর্কে নানা উল্লেখ ও মন্তব্য রচনাটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে "প্রসঙ্গ"

শীর্ষক অংশে। সর্বশেষে গ্রন্থটির মূল্য বিচার করা হয়েছে দুটি প্রবন্ধে। আলোচনা গ্রন্থশেষে সংযোজিত হল। পাঠকমনে কোনরূপ পূর্বসংস্কার সৃষ্টি না করাই এর উদ্দেশ্য। পাঠক মূল বই পড়ে যে সব কথা ভাববেন, সম্পাদকদের বক্তব্যের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখতে পারবেন, একমত বা দ্বিমত পোষণের অধিকার তাঁরই।

ক্ষেত্রগুপ্ত | বিষ্ণুবসু

২। বঙ্গীয় নাট্যশালা-মূলগ্রন্থ

অবতরণিকা

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি কামনা করিয়া থাকেন তাঁহদের অনেকেরই মতে বর্তমান বাংলা নাট্য সাহিত্যের আলেচনা একটু বিশেষভাবে কড়া হাতে করা আবশ্যক হইতেছে। কারণ বাংলা-সাহিত্যের এই অংশে আবর্জনার পরিমাণ বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, নাট্য-সাহিত্য আলোচনার পূর্বেই আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালাগুলির আলোচনা বিশেষরূপে হওয়া অবশ্যক। ইহার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ—

১ম, নাট্যশালা হইতেই নাটকীয় রুচি সৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং নাট্যশালাগুলি যদি সমালোচনার নিকষ-পাষাণে কষিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, সেই সঙ্গে নাটকীয় রুচিও পরিমার্জিত হইয়া যাইবে।

২য়, নাট্যশালা পরিচালনের জন্য নিত্য নূতন নূতন নাট্যকাব্যের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে নাট্যসাহিত্যের পুষ্টি হয় সেই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের বিজ্ঞগণের আলোচনা দ্বারা যদি পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে, তবে সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্যও পরিশুদ্ধ ও সুসংযত হইয়া পড়িবে।

৩য়, নটকুলগুরু, নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের (১৩১০ সালের "বাণী" পত্রিকায় যখন এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন অর্দ্ধেন্দুবাবু পরলোকগত হন নাই) মুখে বহুবার শুনিয়াছি যে, যে সকল সুকুমার কলার মধ্যে কোন একটির সম্যক অনুশীলন করিলে, জাতি-বিশেষ জগতে গৌরব লাভ করিতে পারে, সেগুলির মধ্যে সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্য প্রধান। নাট্যশালায় এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ কলারই যুগপৎ অনুশীলন হয়, নাট্যশিল্পীকে অর্থাৎ অভিনেতৃবর্গকে ত্রিবিধ কলায় ব্যুৎপন্ন হইতে হয়। যে দেশে যে কালে নাট্যশালায় এইরূপ অভিজ্ঞ অভিনেতৃবর্গের উদ্ভব বা

সমাবেশ হয়, সে কালে সে দেশের গৌরব সর্বতোভাবে বর্ধিত হয়। মুস্তফী মহাশয়ের এই সকল কথায় যদি বিন্দুমাত্র সার থাকে, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্গীয় নাট্যশালার আলোচনা একান্ত কর্তব্য।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে নাট্যশালা স্থাপনের পূর্বে নাট্যসাহিত্য অতিশয় ক্ষীণ ছিল। ১২২৮ সালে "কলিরাজার যাত্রা" নামক একখানি নাটকের সমালোচনা রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী" নামক বাংলার তৃতীয় সংবাদ পত্রে হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার পূর্বে বাংলা নাটকের অস্তিত্ব ছিল কি না জানা যায় নাই। বাংলার দ্বিতীয় নাটক "কৌতুক সর্বস্ব" বা "বিদ্যাসুন্দর"। এই বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। "কৌতুক সর্বস্ব" ঠিক কোন সালে রচিত বা কোন সালে প্রথম ছাপা হয় তাহা জানিতে পারি নাই। ১২৩৮ সালে কলিকাতা শ্যামবাজার ৺নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের পূর্বে বাংলা নাটকের অভিনয়, বাঙ্গালীর দ্বারা আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিত রামগতি তর্করত্নের 'মহানাটক' প্রভৃতি ১২৫৬ সালে ও তৎপরবর্তী কালে রচিত হয়। তারচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন নাটক' এবং হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' উহাদেরও পরবর্তী। তৎপর ১২৬১ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'র প্রচার এবং ১২৬৪ সালে উহার অভিনয় হইতে বাঙ্গালীর মধ্যে নাট্যসাহিত্যের এবং নাট্যাভিনয়ের প্রকৃত এবং স্থায়ী অভ্যুদয় বলা যাইতে পারে। ইহার পর ১২৭৯ সালে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এর প্রতিষ্ঠার দিন হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্য যেরূপ ক্ষীণ ছিল, উহার পর হইতে আর সেরূপ ক্ষীণ নাই। বঙ্গীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্যন্ত গ্রন্থ সম্পদে বাংলা নাট্যসাহিত্য বিশেষরূপেই পুষ্ট হইয়াছে, ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এই গ্রন্থরাশির ভাল-মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে তন্মধ্যে আবর্জনার পরিমাণই

বেশী, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে গ্রন্থ সম্পদ বাড়িতেছে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি ও সংস্কার কামনায় আর উদাসীন থাকা বিদ্বৎসমাজের কর্তব্য নহে।

১২৬৪ সালে 'কুলীন-কুল সর্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের দিন হইতে ১৩১৩ সালে 'সিরাজউদ্দৌলা' ও তৎসহচর নাটকগুলির অভিনয়ের দিন পর্যন্ত অর্দ্ধ-শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সময়ের মধ্যে দেশে বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে বহু সমালোচক উদিত হইয়াছেন, বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু কেহই নাটাশালার ন্যায় এত বড় প্রয়োজনীয় একটা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়াই বিবেচনা করেন নাই। মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সময়ে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার যুগ —অভিনেতৃ সম্প্রদায় গঠনের যুগ গিয়াছে। তাহাদের দ্বারা সেই বিষয়েই যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল, তাঁহারা ইহার সংস্কারকল্পে কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই, অথবা তাঁহাদের সময়ে ইহার সংস্কার করিবার অবস্থাও উপস্থিত হয় নাই। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন যখন সমালোচনার সম্মার্জনী-হস্তে সাহিত্য-সংসার আবর্জনা পরিশূন্য করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখনও নাট্যশালার মূল দৃঢ়ীভূত হয় নাই। তখন ন্যাশন্যাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটার কেবল মাত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে কৃতিত্ব ও স্থায়িত্ব লইয়া নিত্য বিবাদও চলিতেছিল। দ্বেষ ও হিংসার ফলে এই সময় কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী ছোট ছোট নাট্যসম্প্রদায় প্রায়ই গড়িতেছিল আর ভাঙ্গিতেছিল। এই যোগ্যতমের উদ্বর্তনের যুদ্ধকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের চাবুক পৃষ্ঠ পাতিয়া সহিয়া লইতে পারে বঙ্গীয় নাট্যশালায় পৃষ্ঠদেশ তখনও ততটা দৃঢ় হয় নাই। সুতরাং তখনকার সে সকল নাট্যশালা দ্বারা আশানুরূপ কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয় নাই। সাহিত্য সম্রাট বঙ্গদর্শনের সিংহাসনে বসিয়া সাহিত্য রাজ্যের সকল বিভাগে অনুশাসন প্রেরণ করিতেছিলেন; কেবল নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশালার দিকে প্রেরণ করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ

কেবল উহার নবীনতা। বঙ্কিমের হাতের চাবুকের ঘা যদি তখন উহাকে সহ্য করিতে হইত, তাহা হইলে, আজ আমরা এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম না। ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর 'বঙ্গবাসী' সংবাদ পত্রের অভ্যুদয় কাল হইতেই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে দেশীয় বিজ্ঞ ও বিদ্যৎসমাজের উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইতেছে বলিতে হইবে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার অদৃষ্টে সেই একটা যুগ গিয়াছে যখন ইহাতে বেশ্যা-অভিনেত্রী লওয়া প্রথম আবশ্যক হইয়াছিল। তখন হইতে সমাজের একদল লোক ইহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদের আক্রমণ সহ্য করিয়া এই প্রতিষ্ঠান যে আজিও দাঁড়াইয়া আছে ইহাই ইহার প্রয়োজনীয়তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেশ্যাসংস্রবে সমাজের নীতি হানি হয়, এই ধুয়া ধরিয়া যাহারা নাট্যশালা হইতে বেশ্যা অভিনেত্রী পরিত্যাগ করিতে বলেন তাঁহাদের যুক্তি-তর্কের কোন প্রতিবাদ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিরবিচ্ছন্ন অমঙ্গল প্রসব করিত, তাহা হইলে এত দিন কোন্‌কালে এগুলির ধ্বংস হইত। যাহা হউক, এক্ষণে বঙ্গীয় নাট্যশালা দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের নৈতিক উন্নতির ক্ষতি হইতেছে কি না তাহার বিচার ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয়কলার উন্নতির প্রতি বঙ্গীয় নাট্যশালার দায়িত্ব কিরূপ এবং তাহা প্রতিপালনের জন্য বর্তমান নাট্যশালাগুলির কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন তাহার আলোচনা করা যাক। প্রধানতঃ চারটি বিষয়ে নাট্যশালায় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক,—পুস্তক নির্বাচন, অভিনয় শিক্ষা, পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদি। আমরা একে একে এই চারিটি বিভাগ ও অন্যান্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব।

পুস্তক নির্বাচন

(১)

সাধারণ নাট্যশালার পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে একটা মস্ত কথা ভাবিতে হয়,—দর্শকের রুচি। সামান্যতঃ দেখিতে গেলে ইহা অতি সহজ কথা।

দর্শক যেরূপ বিষয়ের অভিনয় দেখিতে ইচ্ছুক, সেইরূপ বিষয়ের নাট্য-কাব্য অভিনীত না হইলে, নাট্যশালাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। আমাদের দেশে কিন্তু ইহা একেবারেই না ভাবিলে চলিতে পারে। কারণ আমাদের দেশে দর্শকের রুচি বলিয়া একটা পদার্থই নাই বলা যায়। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে যখন যাহা কিছু দেখাইতেছেন, দর্শকেরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই দেখিয়া যাইতেছে। নাট্যশালা হইতেই যে রুচি গড়িয়া দেওয়া হয়, দর্শকেরা কেবল তাহারই অনুসরণ মাত্র করে। আমাদের নাট্যশালার যুগ কয়টির পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। 'ষ্টার থিয়েটার' জন্ম গ্রহণ করিয়াই উপর্য্যুপরি পৌরাণিক নাটক অভিনয় করিতে লাগিল। নবীন নাট্যশালার নবীন আকর্ষণে দলে দলে দর্শক সে দিকে ছুটিতে লাগিল। বেঙ্গল থিয়েটারে সে সময় ঐতিহাসিক নাটকাবলী—'অশ্রুমতী' 'সরোজিনী' 'পাষাণী' ইত্যাদি অভিনয় হইত। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা দ্বারের সম্মুখে নবীন প্রতিদ্বন্দ্বীর নব অভ্যুদয় দেখিয়া দিশাহারা হইলেন। তাহারাও ঐতিহাসিক নাটক ছাড়িয়া পৌরাণিক নাটক ধরিলেন। কিন্তু একটু নূতনত্ব বিধান করিতে না পারিলে, দর্শক আকৃষ্ট হইবে না। এই ভাবিয়াই যেন তাঁহারা 'প্রহ্লাদ চরিত্রের' ন্যায় ভক্তি রসাত্মক নাটকেও ষণ্ডামার্কের ন্যায় একজোড়া সখের কেলুয়া-ভুলুয়া সঙ ঢুকাইয়া দিলেন। উভয় থিয়েটারে তাহার পর হইতে হরিনামাত্মক গীতিপূর্ণ নাটকের স্রোত চলিল বটে, কিন্তু দর্শকের রুচি ষণ্ডামার্কের বেল্লিকপনার দিকে চলিল। এই ধরণের সঙের চূড়ান্ত শেষে গিরিশবাবুর 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রদর্শিত হইল। গোরক্ষনাথের শিষ্য দামোদর তুলার পোষাক পরিয়া বানর সাজিয়া লাঙ্গুল নাড়িয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া, দুইটি সম্ভ্রান্ত মহিলা· সারি ও ও সুন্দরার গানের তালে তালে নাচিল। —ছবিনি দীনবন্ধু বাবুর হোঁদল কুৎকুতের অপ্রয়োজনীয় কুৎসিত নকল হইলেও নাচে গানে নূতন হইয়া ফুটিল।

দর্শকের চৌদ্দ পুরুষেও এই সকল জিনিস 'পূর্ণচন্দ্রে' বা 'প্রহ্লাদ চরিত্রে' দেখিবে বলিয়া কল্পনাও করে নাই অথবা বাড়ী হইতে এরূপ রুচিও লইয়া আসে নাই। রাজকৃষ্ণবাবু হিরণ্যকশিপুর গুরু-পুত্র মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয়কে দৈব-কল্পনা বলে ভাঁড় সাজাইয়া "দাদা কি হবে বাবা" পর্যন্ত বলাইয়া দর্শকের যে কোন্ রুচির পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। গিরিশবাবু আবার সেই কল্পনাকেই জুটাইয়া গোরক্ষনাথের ন্যায় তীব্র বিরক্ত যোগীর একটা ভূয়া শিষ্য খাড়া করিয়া, তাহাকে বানর নাচাইয়া ছাড়িয়াছেন কেন, তাহাও বুঝা যায় না। এই দুই চিত্রের জন্য দর্শকের রুচিকে দায়ী করিলে, গ্রন্থকার বা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ কেহই যে সাহিত্যের আদালতে বেকসুর খালাস পাইবেন, তাহা আমাদের মনে লয় না। ঐরূপ আর এক কুক্ষণে গিরিশবাবু আবুহোসেনে একজোড়া "দাই-মস্থর" আঁকিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে যত নাটক, যত গীতিনাট্য হইয়াছে তাহাতেই দাই-মস্থরের ন্যায় একজোড়া স্ত্রী-পুরুষের নাচ-গান ঢুকিয়াছে। 'নরমেধ-যজ্ঞেও' রজেকৃষ্ণবাবু একটা বৃথা দৃশ্য কল্পনা করিয়া একজোড়া মালাকার ও মালিনী ঢুকাইতে ছাড়েন নাই। গিরিশবাবু নিজেই এই বিষয়ের উদ্ভাবক হইলেও তাহার 'জনা'র মদন রতিতে এই দাই মস্থরের অপর এক সংস্করণ করা ভিন্ন নাটকে তাহাদের আর কোন প্রয়োজন নাই। সেদিনকার পুস্তক ক্ষীরোদবাবুর 'সাবিত্রী'তেও এইরূপ একজোড়া নাচিয়ে গাহিয়ে চাকর-চাকরানী ঢুকিয়াছে। এখন যদি এই সকল নাট্য সাহিত্যে এইরূপ উদ্ভট চিত্রগুলি দেখিয়া কেহ বলে, ইহাই এ দেশের দর্শকের রুচিকর, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী কে? যদি যথার্থই ইহা দর্শকের রুচিকর হইয়া থাকে, আমরা বলি, তাহার দায়িত্ব গ্রন্থকারের ও নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের,—দর্শকের নিশ্চয়ই নয়। রাজকৃষ্ণবাবু 'প্রহ্লাদ চরিত্রে' ভ্রাতায়-ভ্রাতায় "দাদা কি হবে বাবা" বলিয়া অতি উচ্চাঙ্গের নাটকে একদিন যে সুষ্ঠু ইয়ারকি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেদিন ক্ষীরোদবাবু 'সাবিত্রী' নাটকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে "তুমি যে আমার 'ম'য়েতে আকার" বলিয়া অতি সুন্দররূপে তাহারই

বিবর্তনবাদের প্রমাণ করিয়াছেন। এগুলোকে যদি দর্শকের রুচি পরিতৃপ্তির জন্যই লিখিত বলিয়া গ্রন্থকার ও নাট্যশালাধ্যক্ষেরা সমর্থন করিতে চাহেন, আর দর্শকেরা যদি বলেন, এগুলা গ্রন্থকারদিগেরই কুৎসিত রুচির পরিচায়ক তাহা হইলে বোধ হয় তাহারাই মকদ্দমা জিতিয়া লইবে। প্রহসন সম্বন্ধেও এরূপ। অমৃতবাবু 'বিবাহ বিভ্রাটে' একজোড়া মি. সিং ও বিলাসিনী কারফরমা আঁকিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ঠিক পরের পুস্তক 'তাজ্জব ব্যাপারে' তাঁহার সে ছবি আর ছিল না। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'বিবাহ বিভ্রাট' মিশাইয়া 'রুক্মিণীরঙ্গ', 'অবলা ব্যারাক' ইত্যাদি যে কতক গুলি প্রহসন বাহির করেন সে সবগুলিই ঐ পুস্তকের কেবল হেরফের মাত্র। তাহার পর সিটি থিয়েটারের 'পয়জারে পাজী' প্রভৃতিও এই দলে যোগ দিল। অনুকরণে পুস্তক অনেক হইল, কিন্তু বিষয় একটা ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেখা গেল না; বর্ণনাও একই ধরনের হইতে লাগিল—সকল পুস্তকেই মিঃ সিং ও কারফরমার ছাঁচ ঢালা স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং শিক্ষার উৎকেন্দ্রগামী এক এক জোড়া স্ত্রী পুরুষের ছবি দেখা দিল। এই সকল বিসদৃশ চিত্রের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের রুচি ক্রমশঃ ব্যক্তিগত গালি ও কুৎসা শুনিবার দিকে চলিতে লাগিল। সে ক্ষুধা মিটাইল,—ক্লাসিক থিয়েটার ও মধ্যযুগের মিনার্ভা থিয়েটার। এই দুই নাট্যশালায় অভিনীত ঐ রূপ প্রহসন গুলির আর নাম করিয়া কাজ নাই। উহাদের স্মৃতি যত শীঘ্র লোপ হয় ততই সাহিত্যের এবং সমাজের মঙ্গল। উদাহরণ আর কত দিব? যাহা দেওয়া হইল তাহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইবে; যে রুচি দর্শকের নিজস্ব নহে। নাট্যশালায় পুনঃ পুনঃ অভিনয়ে যে রস, যে রুচি দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, গত্যন্তর না থাকায় দর্শকেরা বাধ্য হইয়া সেই রুচিতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেক স্থলে গ্রন্থকারেই নাট্যশালায় অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, কাজেই অনুকরণ দোষদুষ্ট গ্রন্থের দোষ ও তজ্জনিত দর্শকের রুচি বিকার নিবারণ করিতে নাট্যশালার অধিকারীও

মর্থ হন না। আবার অনেক স্থলে অধ্যক্ষ বা খ্যাতনামা গ্রন্থকারের গ্রন্থের দোষ-গুণ বিচার করিবার উপযুক্ত শক্তি কর্তৃপক্ষদিগের থাকে না, কাজেই তাহাদিগকে উক্ত গ্রন্থকার বা অধ্যক্ষের বাধ্য হইয়া চলিতে হয়। এই সকল ব্যাপারের ফলে দর্শকের রুচি বিকৃত ও নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যশালা কলঙ্কিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে দর্শকের রুচির কথা ছাড়িয়া দিলে, ব্যবসায়-হিসাবে অর্থাগমের কথা আর উঠান চলে না। দর্শকের রুচি যদি নাট্যশালা হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে, তবে অর্থাগমের উপায়ও নাট্যশালারই করতলগত বলিতে হইবে। তবে অর্থাগমের কথায় আর একটা বলা যাইতে পারে। নাট্যশালার ব্যবসায়ে যিনি কেবল অর্থোপার্জন করিব বলিয়া প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পক্ষে এ ব্যবসায় বিড়ম্বনামাত্র। নিশ্চিতরূপে অর্থাগমের জন্য নিশ্চিত বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের —আলু-পটল, ঘি-ময়দা, চাউল-ডাইল, তৈল-লবণ, জুতা-কাপড়ের ব্যবসায় করাই উচিত। নাট্যশালার ব্যবসায়ের সঙ্গে সরস্বতীর অধিকারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই ব্যবসায়ের উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা দেশে নাট্যসাহিত্য, নৃত্যগীত, নাট্যশালা এবং অভিনয়-কলার—এক কথায়, জাতীয় সৌন্দর্য বিজ্ঞানের উন্নতি বিশেষভাবে জড়িত। যে ব্যবসায়ী নাট্যশালার ব্যবসায়ে হস্তার্পণ করিয়া এই-গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া না চলেন, তিনি প্রকৃত দেশদ্রোহী। যাহারা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া, ছাত্রশিক্ষার সুব্যবস্থা না করিয়া, কেবল অর্থাগমের জন্য মহা আড়ম্বর, যত্ন ও চেষ্টা করেন, তাঁহারা যেরূপ অপরাধী হন, অধিকন্তু সমাজের মহা অনিষ্টকারী বলিয়া গণ্য হন, নাট্যশালার ব্যবসায়ে নামিয়া যাহারা ভাল নাটক ও ভাল অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারেন, অথচ কেবল অর্থাগমের জন্য সাহিত্যের ও সমাজের পক্ষে যে কোন অনিষ্টকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ হন না, তাঁহারাও ঠিক সেইভাবেই দেশদ্রোহী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন স্কুল-কলেজে ছাত্রশিক্ষায় সুবিধা না হইলে, ছাত্রগণের অভিভাবকেরা তদ্বিষয়ে যত্ন করিলে, তাহাদের সংশোধন হওয়া সম্ভব; কিন্তু নাট্যশালার দর্শকগণ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় দিন দিন নিকৃষ্ট

আমোদে প্রলোভিত হইলে, নাট্যশালার সংস্কার দিন দিন বহু দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। সেইজন্যই আমাদিগকে বলিতে বাধ্য হইতে হইতেছে যে, যিনি নাট্যশালার ব্যবসায়ে ভদ্রভাবে নামিতে চাহেন, তাঁহাকে পুস্তক-নির্বাচনের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি নিজের সে বিষয়ে ক্ষমতা না থাকে, তবে দেশের সাহিত্য-সমাজ হইতে কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্যে পুস্তক নির্বাচন করাইয়া লওয়া তাহার পক্ষে কর্তব্য। "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" এরূপে পুস্তক নির্বাচন করাইলে আরও একটা লাভ আছে। নাট্যশালার অর্থগ্রাহী গ্রন্থকারকে তাহা হইলে, কতকটা সাবধান হইয়া লিখিতে হয় এবং নির্বাচনের সময়ে তাঁহার পুস্তকের দোষ ভাগ ধরা পড়িতে পারে। ইচ্ছা করিলে, গ্রন্থকার তাহা সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। অনভিজ্ঞ বা সাহসহীন নাট্যশালার অধিকারীকে বিনা-ওজরে, গ্রন্থকারের নামের খাতিরে, আবর্জনাগুলি অভিনয় করিতে বাধ্য হইতে হয় না। নাট্যশালার অধিকারিগণের পক্ষে ইহাও একটা ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় যে, যে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার সময় সেই দ্রব্য দশবার দেখিয়া শুনিয়া লয়, কিন্তু নাট্যশালার অধিকারীরা এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যে গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকারকে পারিশ্রমিক দিবেন, তাহা তাঁহারা যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন না! এই সকল কারণে আমরা অনুমান করি যে, নাট্যশালাধ্যক্ষ ও গ্রন্থকার কেবল এই দুই ব্যক্তির উপর এত বড় দায়িত্ব—পুস্তক নির্বাচনের ভার—না থাকাই উচিত।

প্রস্তাবিত উপায়ে গ্রন্থ-নির্বাচন করাইতে অনেক প্রাচীন নাটককার হয়ত সম্মত হইবেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দৃঢ় ধারণা আছে যে, নাট্য সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রবীণ রথী,—তাঁহারাই বর্তমান নাট্যসাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থরাশি অভিনয় করিয়াই বঙ্গীয় নাট্যশালা বর্তমান উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাঁহারা যেমন নাটক বুঝেন, এমন আর কাহারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। তাঁহাদের এই ধারণার শেষাংশ ব্যতীত আর সমস্ত ঠিক। নাট

ও নাট্যশালা লইয়া সারা জীবন কাটাইলে নাট্য-ক্ষেত্রের ভেদাভেদ জ্ঞান জন্মে বটে, কিন্তু যদি সেই সঙ্গে পাণ্ডু রোগীর পীত দৃষ্টির ন্যায়, নাট্যশালার বাহিরে নাট্যরসজ্ঞ, কাব্য কলাবিৎ, দোষ গুণ বিচারক্ষম, সমাজের রুচির গতি লক্ষ্য-কারী ব্যক্তি যে থাকিতে পারেন না, এই ভুল ধারণাও তাঁহাদের জন্মে, তবে, তাহা সেই ভূয়োদর্শনের কুফল বলিতে হয়। একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, যেমন-তেমন জ্ঞান লইয়া যেমন-তেমন একখানা সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়া বসিয়া সমালোচনার কলম ধরিলেই যে, যথার্থ বিচার-শক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠিবে, ভগবানের অনুগ্রহ বোধ হয়, এমন সুলভ প্রাপ্য নহে। তবে একথাও ঠিক নহে যে, যেহেতু অধিকাংশ সম্পাদক নাট্য ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, প্রবীণ নাটককারগণের ন্যায় নাট্যশালা বিষয়ে বহুদর্শী নহেন, কেবল সেই নিমিত্তই নাটক সমালোচনার অনধিকারী! নাটককার ও নাট্যশালাধ্যক্ষগণের এ ভুল ধারণা দূর হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাঁহারা সাধারণের সমক্ষে অভিনয় করিতেই অধিকারী নহেন। যদি তাঁহাদের অপেক্ষা সাধারণের মধ্যে নাটকীয় জ্ঞানের অভাব আছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহারা সাধারণের তৃপ্তি-বিরক্তির মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকেন কেন? তাঁহাদের ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত ও যেভাবে অভিনীত হয়, তাহার সকলগুলিই যে সাধারণের গ্রাহ্য হয়, তৃপ্তিপ্রদ হয়, এমন নহে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের ঐ ধারণার মূলে কিছু অভিমান, কিছু ভ্রম আছে। সাধারণকে তৃপ্তি দিবার জন্য যে ব্যবসায়, সে ব্যবসায়ের ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণের অভিমত যত বেশী ব্যবহার করা যাইতে পারে, ততই ভাল বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই আমরা অসমর্থ পক্ষে কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শে অভিনেতব্য পুস্তকগুলি নির্বাচন করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে। "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।' সমালোচনা যেমন ব্যক্তি দ্বারাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু না কিছু সার থাকিবেই, সেই সারটুকু গ্রহণ করা নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের কর্তব্য। সমালোচনার প্রতি

উপেক্ষা প্রদর্শনে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরুষত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না।

পুস্তক নির্বাচন কালে, আজকাল নাট্যব্যবসায়ীরা যে কোন রসের কাব্য হউক, তাহাতেই হাস্যরস-বাহুল্য এবং নৃত্যগীতের প্রাচুর্য খুঁজিয়া থাকেন। ইহার জন্যও তাঁহাবা দর্শকের রুচিকে দাযী করিয়া থাকেন। অনেকে আবার বিজ্ঞের মত বলেন, নাট্যশালা আমোদ-আনন্দের স্থান, এখানে লোকে করুণ-রসাত্মক অভিনয়-দর্শনে সারারাত কাঁদিযা কাতর হইতে চাহে না বা শান্তরসের অভিনয়ে গম্ভীর ভাবের ভারে অবসন্ন হইতে চাহে না। যাঁহারা পূর্বোক্ত রূপ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহারা আবার আরও বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেন, করুণরসের মধ্যে মধ্যে হাস্যরস বা শান্তরসের মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত-রসের অবতারণা এবং নৃত্যগীতের প্রাচুর্য না থাকিলে, দর্শকদিগের হাঁফ ছাড়িবার উপায় হয় না। তাঁহারা প্রায়ই ইংরাজী 'Relief' কথাটি ব্যবহার করিয়া বলেন, ঐরূপ দৃশ্য সংযোগ না করিলে দর্শকদিগকে 'Relief' দেওয়া যায় না। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিগুলির কোনটিই ঠিক নহে। দর্শকের রুচি কোথা হইতে কিরূপে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা পূর্বেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, সুতরাং নাট্যব্যবসায়ীদের সে আপত্তি চলে না। সর্বত্র হাস্যরস ও নৃত্যগীত বাহুল্য দর্শকেরা চাহেন কি না, সে বিষয়ে বিচার চলিতে পারে। 'নীলদর্পণের' ন্যায় গীতমাত্রহীন নাটকের শুধু ক্রন্দনের অভিনয় দেখিবার জন্য লোকের যে আগ্রহ দেখা যাইত, আমাদের বিশ্বাস, লোকের সে আগ্রহ কিছুই কমে নাই, তবে যদি কোন নাট্যব্যবসায়ী বলেন, তাহার অভিনয়ে পূর্বের ন্যায় এখন আর অর্থাগম হয় না, আমরা তাহার অন্য কারণ নির্দেশ করিতে পারি। এখন কোন নাট্যশালায় নীলদর্পণের শিক্ষা-দান পূর্বের ন্যায় পরিপাটিরূপে হয় না। পুরাতন পুস্তক বলিয়া সকলেই ইহার শিক্ষায় অল্পসময় ব্যয় করেন। দু-একজন পুরাতন অভিনেতা পাইলেই পাঁচ-সাত দিনের শিক্ষায় নীলদর্পণকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়; কিন্তু নীলদর্পণে যেরূপ ভাষা-বৈচিত্র্য ও ঘটনা-বৈচিত্র্য আছে, তাহা আয়ত্ত করিতে,

আজকালকার অধিকাংশ অভিনেতার পক্ষে যে সুদীর্ঘ সময় আবশ্যক হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কোন নাট্যশালাধ্যক্ষ তত বেশি সময় দেন না, কাজেই অর্ধশিক্ষিত নীলদর্পণের অভিনয়ে পূর্ণ লাভ হয় না। পুরাতন পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দিয়া নূতন পুস্তকের কথা ধরিলেও দেখা যায় 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' বা 'হারানিধির' অভিনয়ে লোক এখনও মুগ্ধ হইয়া থাকে। এই সকল নাটকে যদিও বর্ণনীয়-রসের বিরুদ্ধ-রস সমাবেশ করিতে গ্রন্থকার ত্রুটি করেন নাই, তবুও এ বিষয়ে আমরা যত লোকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই বলেন, এই সকল নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্য অতি সুন্দর এবং এই সকল পুস্তক অতীব মর্ম্মস্পর্শী, অথচ এই সকল পুস্তকে শিক্ষার জন্য যতটা সময় আবশ্যক, পুনরভিনয় কালে ততটা সময় কেহই দেন না। প্রসঙ্গতঃ বলিতে হইতেছে যে, এই সকল গ্রন্থে বিরুদ্ধ-রস সমাবেশ উপলক্ষে অনেকেই বলেন, প্রফুল্লের মত নাটকে মদনদাদার ন্যায় বিয়ে-পাগলা বুড়ো আঁকিবার কোন সার্থকতা নাই; সেজন্য দীনবন্ধুর "রাজীবলোচন" ও "ভুব্‌নো-নসে-রতা" সাহিত্যে বাঁচিয়া থাকিলেই চলিতে পারে। মদনদাদাকেও গিরিশবাবু সমান ওজনে সর্বত্র বজায় রাখিতে পারেন নাই। প্রফুল্লের হঠাৎ বক্তৃতায় জ্ঞানপ্রাপ্ত মদনঘোষ যে কথাগুলি বলে, সেগুলি প্রফুল্ল নাটকের অঙ্গে ব্রণ-স্বরূপ হইয়া আছে। মদনদাদার খাতিরে খেম্‌টাওয়ালীর সহিত বিবাহের কল্পনা দীনবন্ধুর কল্পিত রতার বধূবেশ অপেক্ষা উজ্জ্বল নহে, অথচ তাহাই আঁকিয়া গ্রন্থকার অনর্থক প্রফুল্ল নাটককে নাচে গানে ভারী করিয়া তুলিয়াছেন। জগার যে প্রকৃতি, কাঙ্গালীচরণের যে প্রকৃতি, তাহাতে তাহাদের বাসায় এরূপ আমোদ প্রমোদ নাচগানের ব্যবস্থা করাই এক প্রকার অস্থান প্রযুক্ত ব্যাপার; সুতরাং কেবল নাচগান দিবার খাতিরে অস্থানে কবি সর্ববিধ অসংলগ্নতা স্বীকার করিয়াও, ইহার উপরে আবার জোড়া দুই-তিন খেমটাওয়ালী আনিয়া হাজির করিয়াছেন। এই হিসাবে "বলিদানে"র জোবীর গানগুলিও বিষম আপত্তিকর। জোবী কবির একটি অপূর্ব কল্পনা স্বীকার করি। কিন্তু তাহাকে পাগলী বলিয়া পরিচিত করা আর তাহার মুখে

যেখানে সেখানে যা' তা' গান দেওয়া কবির পক্ষে একান্ত অন্যায় হইয়াছে। এই গানগুলিতে জোবীর সৌন্দর্যহানি ঘটাইয়াছে। বলিদানের কোন পাত্র-পাত্রীই এই নাটক বর্ণিত কোন অবস্থায় গান গাহিতে পারে না, তাহা আমরাও যেমন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, গিরিশবাবুও যে তেমনি বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। জোবীর ন্যায় কল্পিত-চিত্রও যে বলিদান নাটকের উপযোগী কোন গান গাহিতে পারেন না, তাহা কবি আমাদের অপেক্ষা আরও তীক্ষ্ণ ভাবেই অনুভব করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমরা জোবীর গানের ভাব ও ভাষা হইতেই বুঝিতে পারি। জোবী যে যে স্থানে যে যে ঘটনায় পড়িয়া গান গাহিয়াছে, সেই স্থানগুলি গান গাহিবার পক্ষে কত বেশী পরিমাণে অনুপযোগী, তাহা আমাদের অপেক্ষা প্রবীন নাট্যকার গিরিশবাবু নিশ্চিতই ভাল বুঝিয়াছেন, নতুবা তাঁহার ন্যায়, সুমধুর, সুসঙ্গত, সদ্ভাবপূর্ণ, অদ্বিতীয় সঙ্গীতরচক প্যারী কবিরত্নের 'রেলের গাড়ীর গান' 'গ্যাস লাইটের গান' 'শাশুড়ীর গালাগালির গান' 'শাঁকের ডাকে প্রাণ কাঁপিবার গান' রচনা করিয়া 'রাত-ভিখারীর' পয়সা রোজগারের সুবিধা করিয়া দিতেন না। একটু স্থির হইয়া দেখিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল গান দিবার খাতিরে ও বর্তমান নাটক রচনার প্রথায় বাধ্য হইয়া গিরিশবাবুকে কত ক্ষোভের সঙ্গে, কত কষ্ট কল্পনা করিয়া, অযথা স্থানে জোবীর মুখে গান দিতে হইয়াছে এবং তাহার গানের জন্য উদ্ভট, অসংলগ্ন বিষয় ও ভাষাও গড়িয়া দিতে হইয়াছে।

"বলিয়ে দিচ্ছিস্ পেটের মেয়ে বাক্স বুকে নিয়ে সাধে"
"খালো কনে আফিং কিনে লাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি
কচ্ছিতে অমর কনের শাশুড়ী।

*　　　*　　　*

শাশুড়ীর মুখের তোড়ে দৌড় মারে ডোম হাড়ি,

*　　　*　　　*

ঝি-রাঁধুনী রাখ্‌বে বুঝি শোন গতরখাগী,
উলু নয় রোদন ধ্বনি প্রাণ কাঁপে শাঁখের ডাকে,

*　　　*　　　*

বাপ-মারে বালাই ভাবে বালিকার মুখ আর কে চাবে।"

ইত্যাদি কথাগুলি যে কোনদিন গানের উপযোগী বিষয় নহে, ইহা গিরিশবাবুর ন্যায় প্রবীন ও উৎকৃষ্ট গীতরচয়িতার বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় নাই; কিন্তু কি করিবেন? জোবীর গান গাহিবার কোন বিষয় নাটকের ঘটনাবলী হইতে স্বভাবতঃই সূচিত হইতে পারে না, তাই এমনি করিয়া "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন"—হিসাবে, থিয়েটারী মনিবের পকেটের দিকে ও তাঁহার তৃপ্তি-বিরক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল গান দিয়াছেন। 'হারানিধি'তেও ঐরূপ সুশীলার ন্যায় ব্রহ্মচারিনী দ্বারা "ছড়ি হেমাকে হাতে ভাতার এসেছে"—ইত্যাদি ইয়ার্কির গান শোনান একান্ত অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নাটকে ঐ দোষগুলি যত কটু বোধ হয়, গীতিনাট্যে আবার ঐগুলি তিক্তাতিতিক্ত হইয়া পড়ে। নাটকের ওরূপ দৃশ্যগুলি বাদ দিলেও দর্শকের দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার এবং তৃপ্ত হইবার অনেক ব্যাপার থাকে; কিন্তু গীতি নাট্যের লঘু বিষয়ের মধ্যে এরূপ অসম্বদ্ধ ব্যাপার থাকিলে, তাহা বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে। ক্ষীরোদবাবুর আলিবাবার "দিদি কেন ডাক দিলি মোরে" ইত্যাদি গানগুলি এইরূপ বিষয়ের সুস্পষ্ট উদাহরণ। ক্ষীরোদবাবুও যে এ কথা বুঝেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ এই গানেরই পর, তিনি যে ভাবে কথোপকথন রচনা করিয়াছেন, তাহাতে গানের উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই রাখেন নাই। এই গানগুলি যেন বুদ্বুদ মাত্র। আজ-কালকার গতানুগতিকন্যায় গ্রন্থ রচনার অনুকরণ প্রিয়তা হইতে উহাদের উদ্ভব। গিরিশবাবুর 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকেও অস্থানে রসিকতা প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে করিমচাচার সহিত জহরবার ইয়ার্কিটুকু নিতান্ত অসহ্য। আমরা সাহস করিয়া শপথপূর্বক গিরিশবাবুকে বলিতে পারি যে, ঐ দৃশ্যে তাঁহার

"শুয়ে-পেত্নী-প্রাণের" কথা শুনিয়া কোন দর্শকের পোড়ামুখে এক বিন্দুও হাসি ফুটে না, ফুটাতে পারে না! কারণ তখন সকলেই সিরাজের ভাগ্যে কি হইল ভাবিয়া উদ্বিগ্ন থাকে; তখন গিরিশবাবু সাদরে আহ্বান করিলেও, কেহই তাঁহার শুয়ে-পেত্নীর সঙ্গে গাছের ডালে শুইয়া, রসানুভব করিতে কোন ক্রমেই প্রস্তুত থাকে না। তবে আজকালকার এক একজন তরল প্রকৃতির দর্শক কোনরূপ ইয়ার্কির কথা পাইলেই হাসিয়া থাকেন, সে হাসিকে গিরিশবাবু অবশ্যই রসবোধ জনিত তৃপ্তি-বিকাশক হাসি বলিবেন না। আরও এক কথা 'সিরাজ-উদ্দৌলার ন্যায় উচ্চাঙ্গের নাটকে শুয়ে-পেত্নীর ন্যায় অতিমাত্র গ্রাম্য কল্পনা, করিম চাচার মত নবাব পার্ষদের মুখে দিয়া জহবার ন্যায় মহিলার প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, কিরূপে সুসঙ্গত হইল, তাহা বুঝি না। নবাব-দরবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যে বাগবাজার নিবাসী মৎস্যজীবী নিকারী মুসলমান নহে, ইহা মনে রাখা উচিত ছিল।

অস্থানে হাস্যরসের প্রয়োগ চেষ্টার উদাহরণ আধুনিক নাটকাদি হইতেও আরও অনেক দেখান যাইতে পারে; কিন্তু আমরা এ প্রবন্ধে সমালোচনা করিতে বসি নাই। কেবল আমাদের কথার প্রমাণ স্বরূপ দু চারিটা উদাহরণ উদ্ধৃত ও তাহার ব্যাখ্যামাত্র করিয়াছি। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নাটকগুলিতে রসিকতা বা গানের এরূপ অস্থান প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়; তবে তাঁহার 'বিমাতা' নাটকে এক "দিদিমনি না জানতে পারে" রচনার দৃশ্যটিই এরূপ ব্যাপারের চূড়ান্ত উদাহরণ। এই নাটকে এই বটুক-ভাইটারই কোন আবশ্যক ছিল না। সংস্কৃত-সাহিত্যে নাটকের রসবিচার স্থলে লিখিত আছে, করুণ রসের বিরোধী হাস্যরস, আর শান্তরসের বিরোধী ভয়ানক রস। এখনকার নাটককারেরা এ কথাটার প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখেন না। কেহ কেহ উহার কদর্থ ঘটাইয়া বলেন, একই দৃশ্যে হাস্যরস ও করুণ রসের বর্ণনা করা অলঙ্কার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। উক্ত বিধির ঐরূপ অর্থ আমরা স্বীকার করি না। পূর্বদৃশ্যে যে রস বর্ণিত হইল, পরদৃশ্যে তাহার বিরোধী রসের বর্ণনা হইলে,

পূর্বদৃশ্যের অভিনয়ে দর্শকের হৃদয়ে যে সদ্ভাব জন্মিয়াছিল, তাহার হানি হয়; ইহা কবি, আলংকারিক এবং দার্শনিকেরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই, ঐরূপ বিরোধী রসের বর্ণনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ বলিবেন, তাহা হইলে, কোন নাটকেই একটি রসের অতিরিক্ত অন্য রস বর্ণনার অবসর হয় না। তাহা ঠিক নহে,—একদৃশ্য বর্ণিত রসের বিরুদ্ধরস ঠিক তাহার পরবর্তী দৃশ্যে বর্ণনা করিতে নাই। কাব্যের স্থায়ী রসের সহিত সঞ্চারী রসের বিরোধ না ঘটে, ইহাই নির্দেশ করা অলঙ্কার শাস্ত্রের ঐ বিধানের ফলিতার্থ। গ্রন্থ নির্বাচনকালে নাট্যব্যবসায়ীদিগের এই সকল দোষাদোষ বিচার করিয়া গ্রন্থ লওয়া উচিত; নতুবা তাঁহাদের সুযশের অভাব হয়। এইরূপ দোষযুক্ত পুস্তকের অভিনয়েই দর্শকের রুচি বিকৃত হয় এবং এইরূপ পুস্তকের অভিনয়ের আকাঙ্খা দর্শকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। যদি আমাদের একথা মিথ্যা হইত, তাহা হইলে, গিরিশবাবু 'সিরাজ-উদ্দৌলা'য় "ঐ আসছে নবাব বাহাদুর" প্রভৃতি গানের দৃশ্যগুলি এবং গানগুলি রচনারও বৃথা পরিশ্রম হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিতেন। যদি গ্রন্থকারের দোষে কোন নাটকে এইরূপ অপদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে, নাট্যব্যবসায়ীরা সেগুলি বাদ দিয়াও অভিনয় করাইতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের সময় সংক্ষেপ, কার্য-সংক্ষেপ, ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে এবং দর্শকগণেরও অধিক তৃপ্তি বিধান হইতে পারে। ঐরূপে অভিনয় হইলে 'সিরাজউদ্দৌলা' 'বলিদান' 'প্রফুল্ল' প্রভৃতির ন্যায় মনোজ্ঞ নাটকগুলি আরও দীর্ঘকাল অর্থপ্রদানে সমর্থ হইত। সরলা নাটকে এরূপ অস্থানে গান বা হাস্যরসের অবতারণা নাই, উক্ত নাটকে করুণরস যতই জমাট হইয়া আসিতে থাকে। "নীলকমল" "গদাধরচন্দ্র" প্রভৃতি সামান্য হাস্যরসের চিত্রগুলি নাটকের অঙ্গ হইতে ততই দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে, অথচ ভাবের উচ্ছ্বাসে দর্শকগণ তজ্জন্য একটুও অভাব বোধ করেন না। ঐ নাটকে শ্যামা দাসীর এমন অনেক অবসর ঘটিতে পারিত, যেখানে সে জোবীর মত, কলিকালের ভ্রাতার গুণ বর্ণাইয়া দুটা গান গাহিতে পারিত; কিন্তু কবির গুণপনা এবং নাটককারের অশেষ করুণায়

আমরা শ্যামার গান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সুখী বৈ দুঃখিত নহি। দেখা আবশ্যক, সরলা যত পয়সা দিয়াছে বলিদান তত দেয় নাই।

Relief এর কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভুল বুঝেন। গভীর ভাবের ক্রম রক্ষাই সৌন্দর্য; তাহার অবিচ্ছিন্ন উপভোগই তৃপ্তিকর। রস বিপর্যয় ঘটাইয়া মাঝে মাঝে ছেদ ভেদ বিধান করিলে ভাবসঞ্চয়ে বড়ই ব্যাঘাত ঘটে। বলিদান সমালোচনায় "অর্চনা" পত্রিকার সমালোচক দর্শকের প্রতি যে অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিরুদ্ধ রসের বর্ণনা দ্বারাই করা হয়, রস বিশেষের অনবচ্ছিন্ন বর্ণনায় তাহা হয় না। দুলালচাঁদের কথা আমরা এক্ষেত্রে কিছু বলিব না কারণ আমরা এখানে গ্রন্থ-সমালোচনা করিতে বসি নাই।

নাটকের নির্বাচনকালে এ-সকল কথাও ভাবিয়া দেখা, নাট্যব্যবসায়ীগণের ও নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের একান্ত কর্তব্য। এই প্রকারে দোষ গুণ দেখিয়া গ্রন্থ নির্বাচন করিলে, নাট্যশালার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

নাট্যব্যবসায়ীদিগের আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নূতন নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রস্তুত করা যেমন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, তেমনি নূতন নূতন নাটক লেখকেরও আদর করা তাঁহাদের কর্তব্য। প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থ পাইলে, কোন নূতন লেখকের গ্রন্থ কোন নাট্যব্যবসায়ী এখনকার দিনে লইতে চাহেন না। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এখন মিনার্ভা থিয়েটারে আর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ষ্টার থিয়েটারে আছেন।* কাজেই ক্লাসিক থিয়েটার, নূতন ন্যাশনাল থিয়েটার প্রভৃতিতে পুস্তকাভাব ঘটিতেছে। শ্রীযুক্ত রামলাল

* এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময় (১৩ ৪ সালে) ক্ষীরোদবাবু ষ্টারেই ছিলেন। পরে কিছুদিন কোহিনুর থিয়েটারে নামিয়া (১৩ ৬ সালে) আবার মিনার্ভায় আসিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি যাহারা অল্প বিস্তর সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এই সকল থিয়েটার তাহাদের উপর ভরসা স্থাপন না করিয়া বা তাহাদের দ্বারা সময়োপযোগী নাটকাদি না লেখাইয়া, অতি পুরাতন নাটক সকলের পুনরবতারণা করিয়া এক রাত্রিতে দুই তিনখানি পুস্তকের অভিনয় দ্বারা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। ইহা দ্বারা প্রথম প্রথম কিছু সুবিধা হইলেও শেষে অতি মাত্র ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। এখনকার থিয়েটারে আজকাল যে সকল নবীন নাট্যকার দুই চারিখানি নাটক লিখিয়া 'বাহবা' লইতেছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কেবল অনুকরণপ্রিয় ও অনুলিপি পরায়ণ লেখক; তাহাদের গ্রন্থে কোন নাট্যব্যবসায়ীর কোনদিন উন্নতির আশা নাই। কুৎসিত রচনা প্রিয় লেখক দ্বারা নাট্যব্যবসায়ের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং সর্বনাশ সাধিত হয়। এ সকল কথার প্রমাণ উদাহরণাদি দ্বারা সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা গত পাঁচ-সাত বৎসর কাল নাট্য জগতের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ক্লাসিক থিয়েটার দুই-তিন বৎসর পূর্বে অর্থোপার্জনে নাট্য-জগতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার পতন হইয়াছে। গেইটী আরোরা ইউনিক গ্রাণ্ড প্রভৃতি অল্পদিন স্থায়ী নাট্যব্যবসায়ীরা লুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তর্বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক ও গ্রন্থকার নির্বাচনের দোষই প্রধান বলিয়া অনুমিত হইবে। এই জন্য নূতন নূতন নাটক-লেখকগণকে আশ্রয় করা এবং তাঁহাদিগকে সময়োচিত নাটক-রচনায় সাহায্য করা, নাট্য-ব্যবসায়ীদিগের প্রধান কর্তব্য। এমারলড্ থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ মিত্রের সদ্ গ্রন্থরচনার কলমটি থামিয়া গিয়াছে। এখন তিনি মিনার্ভার অন্য আর একটি কলম ধরিয়া গড্ডলিকা প্রবাহে গা-ভাসাইয়া দিয়া এখনকার সুরে 'শিরী-করহাদ' 'তুফানি' 'দলিতা-কণিনী' 'সাহাজাদী প্রভৃতি লিখিয়া অপেরার আসরে অপ্রকৃত-রুচির ঢেউ তুলিয়া মাতাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় এখন গীতিনাট্যের অভিনয় মধ্যে বঙ্গ মঞ্চে প্রকৃত প্রস্তাবে বানর নাচ ও ভালুক

নাচ না হইলে আর চলে না। ভূত-পূর্ব এমারেলড্ হইতেই অতুলবাবু, সুরেন্দ্র বাবুর এবং ক্ষীরোদবাবুর অভ্যুদয়।

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুর পর ক্ষীরোদবাবু ফুটিলেন এবং 'আলিবাবা' তাঁহার যশের জন্মদাতা হইলেও এমারেলডে তাঁহার প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা'র অভিনয় হইতেই লোকে বুঝিয়াছিল, ক্ষীরোদবাবু একদিন দাঁড়াইবেন ভাল। প্রকৃত প্রস্তাবে 'প্রতাপাদিত্য' ক্ষীরোদ বাবুর প্রতাপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর 'লালা গোলক চাঁদ' আর রামলালবাবুর 'কাল পরিণয়' তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে পরিচিত করিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের এখন বক্তব্য যে যদি কোন নাট্য-ব্যবসায়ী এখন নাট্য-ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার ধনী সংগ্রহের ন্যায় উপযুক্ত গ্রন্থকার সংগ্রহ করাও আবশ্যক। কেবল গিরিশবাবু, অমৃতবাবু বা ক্ষীরোদবাবুর পুস্তকের লোভে বসিয়া থাকিলে কেহ কোন দিন সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। সকলে একজনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, সে ব্যক্তিকে কোনও সম্প্রদায়ের অধীনতা স্বীকার করিতে দিতে নাই, কিন্তু প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিতে হইলে, সে জন্য যে বন্দোবস্ত আবশ্যক, তাহা আমাদের দেশে খাটিবে না। বস্তুতঃ ঘটিয়াছে তাই। ষ্টার থিয়েটার ত্যাগ কালে গিরিশবাবু যে পারিশ্রমিক লইয়া গ্রন্থ লিখিয়া দিতেন, এখন কোন থিয়েটারে তাহাকে একচেটিয়া করিয়া রাখিতে গেলে, তাহার তিন গুণ পারিশ্রমিক তাঁহাকে দিতে হয়! ইহাও নাট্যব্যবসায়ীর পক্ষে ভাবিয়া দেখিবার কথা।

যাক্, পুস্তক নির্বাচন ও গ্রন্থকার নির্বাচন—সম্বন্ধে এখনকার দিনে বঙ্গীয় নাট্যশালায় যে সকল দোষ বর্তমান আছে, আমাদের যথাসাধ্য তাহার উল্লেখ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করিলাম। নাট্য-ব্যবসায়ীরা ইহা হইতে কিছু মাত্র উপকৃত হইলে শ্রম সফল হইবে।

অভিনয় শিক্ষা

এইবার অভিনয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিতেছি।

আমাদের দেশে নাট্যশালায় কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিক্ষিতের কার্যকলাপ দেখিয়া বিচার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশে অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কোন নাট্যশালার সংস্রবে বিদ্যালয়বৎ কোন অনুষ্ঠান নাই বা 'লেক্‌চার' দিয়া কোন কিছু শিখাইবার ব্যবস্থা নাই। অভিনেতা হইতে হইলে, প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়াদি কি, তাহা সাধারণভাবে অর্থাৎ এ বিদ্যার বর্ণ-পরিচয় হিসাবে,—শিখাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। অভিনয় উদ্দেশ্যে কোন পুস্তক বিশেষ যখন কোন নাট্যশালায় মহলা দেওয়া হইতে থাকে, তখনই যাহাদের ভাগ্যে যে যে ভূমিকা শিখিবার ভার পড়ে, সেই সেই ব্যক্তিকে তদগত বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে, যতটুকু কলা-কৌশল শিখাইবার আবশ্যক, ততটুকু শেখান হয়। অপর সকলকে উপস্থিত-মাত্র থাকিয়া দেখিতে শুনিতে হয়। এই প্রথায় আজকাল যাহা ফল হইতেছে, আমাদের বিবেচনায়, তাহা আদৌ শিক্ষা নামেরই যোগ্য নহে। অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় এবং গিরিশবাবুর শিক্ষায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৺মহেন্দ্রলাল বসু, ৺মতিলাল সুর, ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় স্বনামখ্যাত অভিনেতৃগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল অভিনেতার পর শিক্ষাদান কার্যের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়ায়, গত বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অভিনয় বিদ্যার মূলসূত্রগুলি কিছুই ধরিতে পারেন নাই এবং শিখিতেও পারেন নাই। এরূপ অভিনেতার মধ্যে অনেকে আজকাল বয়সে প্রবীণতা-লাভ করিয়াছেন, অভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, নব্যদলের নিকট আদর্শ

বলিয়াও গণ্য হইয়াছেন; কিন্তু তবু আমরা বলিব, তাঁহাদের অনেকেই অভিনয়-বিদ্যার মূলসূত্রগুলি শিখিবার সুযোগ পান নাই এবং আজিও জানেন না।

সাবেক ন্যাশান্যাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিযোগিতায় অভিনেতৃবর্গের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি ছিল। তখনকার শিক্ষকেরা স্ব স্ব শিষ্যবৃন্দকে প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের সাহচর্যে জয়লাভ করিতে চেষ্টা পাইতেন কিন্তু যেদিন হইতে ষ্টার থিয়েটার জন্ম গ্রহণ করিল, ন্যাশান্যাল থিয়েটার মারা গেল, ষ্টারে ও বেঙ্গলে প্রতিযোগিতা দাঁড়াইল, সেই দিন হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালাদ্বার একটি সুকুমার কলা-বিদ্যার উন্নতি ও পুষ্টির দিক হইতে অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি বিচ্যুত হইল এবং নাট্যশালাকে কেবল আনন্দপ্রদ, অর্থকর ব্যবসায়ের দিকে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু কলিকাতায় থাকিতেন না, কাজেই গিরিশবাবু নাট্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রূপে অবস্থান করিয়া ষ্টার থিয়েটারের অভিনেতৃদলকে এক নূতন প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু দ্বারা ঐ সময় যে নবীন শিক্ষা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই গুণে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, * শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি থিয়েটারের বর্তমান প্রবীণ অভিনেতৃগণের উদ্ভব হইল। ঐ প্রণালীর শিক্ষাতেই শিক্ষিত হইয়া উত্তরকালে মিনার্ভা থিয়েটার হইতে শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনুকূল বটব্যাল প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছে। এই সময় শহরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাট্য সম্প্রদায় স্থাপিত হইতে থাকে এবং সেই সকল সম্প্রদায়, উপযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষার অভাবে গিরিশবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই নবীন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি নাট্যামোদী যুবক অভিনেতার দল বর্ধিত করে। এই সকল অভিনেতার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের

* এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময় এই দুই অভিনেতাও জীবিত ছিলেন। কিন্তু আজ আর নাই।

বর্তমান অভিনেতা শ্রীমনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু) শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারকনাথ পালিত, ক্লাসিক থিয়েটারের শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি. এ., শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চক্রবর্তী, শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমহীন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির নাম করা যায়।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, গিরিশবাবু প্রতিষ্ঠিত নবীন শিক্ষাপ্রণালী বঙ্গীয় নাট্যশালাকে কেবল অর্থকর ব্যবসায়ের পদবীতে আরোহণ করাইবার বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই ইহার প্রতি নাট্যসম্প্রদায়ের অধিকারীরা স্বার্থবশে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে ষ্টার, এমারলড্, মিনার্ভা, থিয়েটার স্থাপনের সময় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আবার আসিয়া শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ষ্টার থিয়েটারের দ্বাদশ বর্ষব্যাপিনী চেষ্টায় নাট্যশালা হইতে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর ভাব এক প্রকার উন্মুলিত হইয়া গিয়াছিল, কাজেই অর্দ্ধেন্দুবাবু শিক্ষার ভার লইলেও একবারে পুরাতন প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার অবসর পাইলেন না। এমারলড্ থিয়েটারের প্রথম অভিনীত পুস্তক 'পাণ্ডব-নির্বাসন' একা অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় পুরাতন প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোকে নাই, কেবল কোহিনুরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও ন্যাশন্যালে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় আছেন। দর্শকেরা লক্ষ্য করিবেন, ইঁহাদের অভিনয় প্রণালীই অপর সকল ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র এবং কত সহজ, কত সুন্দর ও কত মনোরম! তৎপরে একমাস পরেই গিরিশবাবু আসিয়া এমারল্ডে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহার 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার ষ্টার থিয়েটারক্ষেত্রে দ্বাদশবর্ষের সুপরীক্ষিত নূতন শিক্ষাপ্রণালী এমারল্ডেও প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদবধি অর্দ্ধেন্দুশেখর বাবুর শতচেষ্টার বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাই প্রবলবেগে প্রচলিত হইল। গিরিশবাবু এই প্রণালী চালাইবার আর একটি সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজরচিত পদ্যছন্দের নাটক। প্রাচীন

ন্যাশান্যাল থিয়েটারের শেষ দশা হইতে অর্থাৎ গিরিশবাবুর অধ্যক্ষতার সূত্রপাত হইতেই গিরিশবাবু গদ্য নাট্যকাব্যের অভিনয় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কার রাখিতে গিয়া গিরিশবাবু যে সুরপ্রধান, সহজসাধ্য, অভিনয়প্রথা প্রবর্তিত এবং নিজে শিক্ষা দান করিয়া যাহার আদর্শ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এই দ্বাদশবর্ষ পরে অর্দ্ধেন্দুবাবুর একার চেষ্টায় আর পরিশোধিত হইল না। মিনার্ভা থিয়েটারের স্থাপনাবধি গিরিশবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু একত্র থাকিলেও গিরিশবাবুর নবীন শিক্ষা-প্রণালীতে সংস্কারবদ্ধ অভিনেতৃবর্গকে লইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু এখানেও পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, কাজেই এখন এই নবীন শিক্ষা-প্রণালীরই প্রাধান্য রহিয়াছে। তবে শতবাধার মধ্যেও তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কোন কোন অভিনেতাতে বেশ সুফল ফলিয়াছে দেখা যায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল, (হাঁদুবাবু), শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দে প্রভৃতি অভিনেতারা এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রীমতী হেনা, শ্রীমতী প্রকাশমণি, শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট), শ্রীমতী চপলা প্রভৃতি অভিনেত্রীরা অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় বিশেষ পটুতা লাভ এবং কলাকৌশলের অনেকগুলি সূত্র শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতির অভিনয় প্রথাও অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), তাঁহার আদিশিক্ষক শ্রীঅমৃতলাল মিত্রের মত একজন 'আড়ষ্ঠ' অভিনেতা ছিলেন। স্বীয় পিতা গিরিশবাবুর শিক্ষাতেও তাঁহার এই আড়ষ্ঠ ভাব ও সর্বত্র করুণ (যেন কান্নার মত) সুরে অভিনয়ের ঢঙ্ বদলায় নাই। শুনিয়াছি, তিনি রঙ্গমঞ্চে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দু-বাবুর নিকট অভিনয় প্রণালীর কোন উপদেশ লইতেন না; কিন্তু 'সিরাজ-

উদ্দৌলা' 'মীরকাসিম' 'বলিদান' প্রভৃতির অভিনয়ে আমরা তাঁহার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি। এই পরিবর্তন অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত পারিপার্শ্বিক অভিনেতৃবর্গের অভিনয় প্রভাবে ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আর আড়ষ্ঠভাব ও কান্নার সুরু ততটা নাই, তবে অস্থানে চীৎকার করা এখনও তিনি ছাড়িতে পারেন না।

আজকাল যে প্রণালীতে নাট্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার উদ্ভবনার ও প্রচারের ইতিহাস আমরা নাট্যশালার বাহিরে থাকিয়া যতটা অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহা এই স্থানে বিবৃত করিলাম। এক্ষণে গিরিশবাবুর এই নূতন প্রথাটি কি এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, যথা জ্ঞান তাহার আলোচনা করিব।

এই নবীন শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতৃবর্গকে আমরা যেভাবে অভিনয় করিতে দেখি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, ইহাদের মধ্যে অনেক অভিনেতারই এই বিদ্যার প্রথম শিক্ষা অর্থাৎ 'বর্ণপরিচয়' পর্যন্ত হয় নাই। এই সকল অভিনেতা নাট্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সময় মনে করেন, দর্শকেরাই তাঁহাদের কথোপকথনের পাত্র, সহযোগী অভিনেতারা তাঁহাদের কেহই নহেন। আমরা দেখিতে পাই, তাহারা কথা কহিবার সময় দর্শকগণের দিকে চাহিয়া, তাঁহাদের দিকেই হাত-মুখ নাড়িয়া মনোভাব প্রকাশ করেন, আর তাঁহাদের সহযোগী অভিনেতৃগণ অনাবশ্যক পাত্র-পাত্রীর ন্যায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ মাত্র করেন। 'স্বগত-বাক্য' অভিনয়ের সময়ে এই ব্যাপারটি বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। অনেকে আবার এতটা বিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন যে কথোপকথনের মধ্য কালে কোন স্বগত বাক্য বলিবার সময় সহযোগী অভিনেতাকে ছাড়িয়া নাট্যমঞ্চের সম্মুখ-প্রান্তে সরিয়া আসিয়া স্বগতবাক্যের কথাকয়টি দর্শকগণের দিকে চাহিয়া বলিয়া পুনরায় সহযোগীর নিকটে ফিরিয়া যান! এরূপ করাটা যে দোষের, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু, গিরিশবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি শিক্ষকগণও ইহা স্বীকার করিবেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রত্যেক নাট্য-

শালায় প্রত্যহ আচরিত এই দোষের নিবারণে কেহই যত্ন করেন না। সেদিনকার অভিনীত টাটকা নূতন নাটক 'মীরকাসিম' এবং 'উলুপীর' অভিনয়েও আমরা এই দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা এরূপ বলিতেছি না যে গিরিশবাবুর উদ্ভাবিত নূতন শিক্ষাপ্রণালীতে এই দোষ তিনি ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তবে একথা অবশ্যই বলিব যে, নাট্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনেতা দর্শকগণের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবেন, ভুলিয়া ভুলিয়া যাইবেন, কেবল অভিনেতব্য অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে আপনাতে আরোপ করিয়া কথা বলিবেন, সহযোগী অভিনেতার সহিতই আলাপের ভঙ্গীতে কথা কহিবেন, তাহার দিকে চাহিয়াই মুখ-চোখের ভঙ্গী দ্বারা বাক্যার্থ প্রকাশে চেষ্টা করিবেন,—অভিনয়ের এই মূলসূত্র, বোধ হয়, এখনকার কোন অভিনেতাকে শিখাইয়া দেওয়া হয় না বা শিখাইয়া দিলেও তাহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম ও তদনুসারে কার্য করিল কিনা, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন না। অভিনেতার নিকট দর্শকগণের অস্তিত্বের এতটুকু পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, তাঁহারা আছেন আর তাঁহাদিগকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া শুনাইতে হইবে। এই স্পষ্ট করিয়া শুনানর অর্থ ইহা নহেযে, অভিনেতারা প্রাণপণে সকল কথাই চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিবেন এবং কেবল দর্শকগণকেই সম্বোধনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া কথা কহিবেন। এই মূল-সূত্র উপদেশ দিতে এবং তাহা শিখাইয়া অভ্যাস করাইয়া দিতে, শিক্ষকের যে যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক, আমরা বহুকাল হইতে কোন নাট্যশালায় কোন শিক্ষককে তাহা করিতে দেখি না।

অভিনয়-বিদ্যার "বর্ণ-পরিচয়"—কালের শিক্ষণীয় আর একটি বিষয়ের প্রতি এখনকার অনেক অভিনেতার ঔদাসীন্য দেখা যায়। অনেক অভিনেতাই আজকাল রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করিতে ও দাঁড়াইতে জানেন না। চারি পাঁচজনে আসিতে হইলে, সকলেই সারি গাঁথিয়া আসেন, সারি গাঁথিয়া দাঁড়ান, আবার সারি গাঁথিয়া চলিয়া যান। ইহা এতই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক বোধ হয়, যে এই প্রথার স্বপক্ষে বলিবার কিছুই নাই; বরং সময়ে সময়ে মনে হয়, ইহারা বুঝি কলের পুতুল অথবা বরযাত্রার রোশনাইর আলোকদণ্ডে দড়িবাঁধার ন্যায়,

ইঁহাদেরও বুঝি কোমরে দড়ি বাঁধা আছে। এইরূপ দল বাঁধিয়া যাতায়াতের প্রয়োজন যদি কোন নাটকে পুনঃ পুনঃ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে জগৎশেঠ রায়দুর্লভাদির পুনঃ পুনঃ আসাযাওয়ার ব্যাপার এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাঁহারা উহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথা সহজেই বঝিতে পারিবেন। এই প্রথার সংশোধন করিতে হইলে শিক্ষকগণের বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। গিরিশবাবুর নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দোষগুলির প্রাবল্য হইয়াছে। গিরিশবাবুর নাটকগুলিতে দৃশ্য-সংস্থানের বেশ সুবন্দোবস্ত নাই। তাঁহার সমস্ত নাটকেরই অধিকাংশ দৃশ্য দাঁড়াইয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া, তিনি এই দোষটি একপ্রকার অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজদ্দৌলার মধ্যে মধ্যে একমাত্র সিংহাসনে উপবেশন ব্যতীত আর কোন দৃশ্যে কাহারও বসিয়া অভিনয় করিবার সুযোগ নাই, এমন কি, শয়ন-গৃহের দৃশ্যের দরবারে, বৈঠকখানাতেও কেহ বসে না। 'মীরকাসিম' নাটকে বক্সারের শিবির মধ্যেও শাহ্‌জাদার বসিবার ব্যবস্থা নাই! রণস্থল, পথ, বনপ্রান্ত, দুর্গদ্বার প্রভৃতি দৃশ্যে বসা যায় না তাহা আমরা জানি; কিন্তু শিবির, কক্ষ, প্রসাদে রাজসভা, মন্ত্রণাগৃহ, ইত্যাদি দশ্যে বসিবার ব্যবস্থা করিলে, এই দোষ যে প্রশামিত হইত না, এমন কথা গিরিশবাবু বলিলেও আমরা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। এই সকল দৃশ্যে বসিবার ব্যবস্থা করিলে, পটপরিবর্তনাদির কিছু অসুবিধা হয়, এরূপ কৈফিয়ত আমরা মোটেই গণ্য করিব না। কারণ অপর গ্রন্থকার সে বাধা অতিক্রমের কৌশল না জানিতে পারেন; কিন্তু আবাল্য-নাট্যমঞ্চবিহারী, নাট্যমঞ্চভেদজ্ঞ গ্রন্থকার গিরিশবাবুর গ্রন্থে দৃশ্য-যোজনায় সে সকল বিষয়ে কোন গোলমালের আশঙ্কা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না। কাজেই গিরিশবাবুর নাটকাদিতে এরূপ দৃশ্যযোজনার জন্য উপবেশনাদির অসুবিধা-জনিত অভিনয় কলার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা গিরিশবাবুরই একপ্রকার অমনোযোগিতার ফল বলিতে হইবে।

গিরিশবাবুর প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে আর একটি দোষ-আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। পদ্যময় নাটকের অভিনয়েই সে দোষ বেশী চোখে পড়ে। সেটি একঘেঁয়ে একটানা এক সুরে আবৃত্তি। নব্য অভিনেতৃবৃন্দের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই দোষে দোষী, অর্থ বুঝিয়া বচনীয় বিষয়ের উপযুক্ত স্বরভঙ্গী অনেকেই করেন না। গিরিশবাবু স্বরচিত পদ্যময় নাটকের অভিনয়ে ছন্দের ঝঙ্কার রক্ষার দিকে একটু বেশী দৃষ্টি দেওয়ায়, কালে অনুকরণ দোষে তাহাও একটি সংক্রামক দোষে পরিণত হইয়াছে। এই দোষটি এমনই দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ অর্থবোধের জন্য যে সকল যতি বা ছেদ লক্ষ্য করিয়া আবৃত্তি করা আবশ্যক, সে সকলের প্রতি লক্ষ্য মোটেই করা হয় না। আমরা দেখিয়াছি, অনেক অভিনেতা পাদচ্ছেদ, অর্দ্ধচ্ছেদ এমন কি পূর্ণচ্ছেদের প্রতিও দৃকপাত করেন না। নব্য অভিনেতৃগণের অনেকের কাছে শোনা গিয়াছে, তাঁহারা একটা সুরের প্রবাহ (flow) রক্ষা করাকে বেশী আদর ও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। কোন কোন বুদ্ধিমান অভিনেতাকে অর্থসঙ্গত ছেদ লক্ষ্য করিয়া আবৃত্তির প্রভেদ দেখাইয়া এ বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্যের কথা বলিলে, তাঁহারা অন্য কোন যুক্তিতর্ক না তুলিয়া বলিয়া থাকেন,—অমুক অভিনেতা এরূপ অভিনয় করিয়া যখন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তখন ইহাকে দোষের বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, আমরাই আদর্শের নিকট পৌঁছিতে পারিব না এবং দর্শকের তৃপ্তিবিধান করিতে পারিব না। এরূপ যুক্তি যে যুক্তিই নহে, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। এই সকল অভিনেতাদের অভ্যাস এমনই বিপথে চালিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাদিগের পক্ষে গদ্যাংশ অভিনয় করা কষ্টকর এবং দর্শকের শ্রবণের পক্ষে আরও হাস্যকর ব্যাপার হইয়া পড়ে। ষ্টার থিয়েটারে সাবিত্রীর অভিনয়ে এইরূপ হাস্যকর অভিনয় আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি।

বর্ত্তমান অভিনয় প্রথায় যে সকল দোষ আছে, তাহার প্রধান চারিটি দোষের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম অভিনয় শিক্ষা দিবার দোষেই যে এই সকল দোষ অভিনেতৃ-সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা দিবার

দোষে অভিনেতৃবৃন্দের আরও অনেক দোষ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি ধরিয়া আলোচনা করিবার স্থান ও অবসর আমাদের নাই। যে প্রধান চারিটি দোষের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, যদি কোন শিক্ষক এগুলির প্রতি অবহিত হইয়া এগুলি সংশোধনে চেষ্টিত হন, অন্যান্য অনেক দোষ তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিপথে আপনিই পড়িবে এবং এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি মার্জিত হইয়া যাইবে।

এখন একটি কথার কৈফিয়ৎ আমাদিগকে দিতে হইবে। আমরা নবীন-শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্তন গিরিশবাবুর দ্বারা হইয়াছে বলিয়া এক প্রকারে গিরিশ-বাবুকে এই সকল দোষের উদ্ভাবক ও পরিপোষক বলিয়া তাঁহার কাছে হয় ত অপরাধী হইয়াছি, কিন্তু এ অপরাধের জন্য আমরা দাণ্ডত হইতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, যখন হইতে এই নবীন অভিনয় প্রথা প্রচলিত হইল, তখন গিরিশবাবুর হাতে নাট্যসমাজ করামলকবৎ ঘুরিতে ফিরিতেছিল। তিনি যদি সে সময় স্বীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া এই সমাজকে সুপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষা-প্রণালীকে বজায় রাখিয়া অভিনেতৃগণকে কেবল সুরে* আবৃত্তি শিক্ষা না দিয়া অভিনয় বিদ্যার মূল-সূত্রগুলি বুঝিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে, কখনই এ সকল দোষ নাট্য-সমাজে প্রবেশ করিবার পথ পাইত না। যে ভাবে শিক্ষা দিয়া তাঁহারা নিজে থিয়েটারের আদিম অবস্থায় "সধবার একাদশী" এবং "লীলাবতী" অভিনয় করাইয়াছিলেন, যে ভাবে শিক্ষা দিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু "নীলদর্পণ" "বিয়ে পাগলা বুড়ো", "জামাই-বারিক", প্রভৃতি অভিনয় করাইয়াছিলেন, সে ভাবে শিক্ষা দিবার কৌশল বা ক্ষমতা যে ৺প্রতাপচাঁদ জহুরীর অধিকারের ন্যাশানাল থিয়েটারের সময়ে বা ষ্টার-থিয়েটার স্থাপনের সময় গিরিশবাবু ভুলিয়া গিয়াছিলেন বা তাঁহার পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য হইয়াছিল, একথা আমরা তো স্বীকার করিবই না এবং এ মোকদ্দমায় জিতিবার

*অর্চনা পত্রিকায় ১৩১৬ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় গিরীশবাবু নিজে প্রবন্ধ লিখিয়া এই সুরে অভিনয় প্রথা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ইচ্ছা থাকিলেও গিরিশবাবুও করিবেন না। আরও একটা কথায় আমরা গিরিশবাবুর এই ইচ্ছাকৃত অপরাধের প্রমাণ দিতে পারি,—সেটা তাঁহার নিজকৃত অভিনয়। তিনি নিজে তাঁহার নিজের পুস্তকের অভিনয়ে, রাম, মেঘনাদ, দক্ষ, প্রভৃতি সাজিয়া কখনও সুরটানা, একঘেয়ে কমা-ফুলষ্টপ্-হীন অভিনয় করেন নাই। অথচ তাঁহারই সম্মুখে অপরে বিপরীত-ভাবে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবাদ করিয়া ফল পান নাই বলিলে, আমাদের কথার একটা জবাবমাত্র হইবে, কিন্তু মীমাংসা হইবে না। তিনিই অধ্যক্ষ, তিনিই নেতা, তিনিই শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, যত্ন করিলে, চেষ্টা করিলে, পরিশ্রম করিলে এ সকল নবোদ্ভাবিত দোষের দূরীকরণ যে একেবারে তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইত, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছি। গিরিশবাবুর পক্ষে একটামাত্র প্রবল যুক্তি আছে;—সুসঙ্গত অভিনয় শিক্ষা দিতে যেরূপ দীর্ঘ-সময় আবশ্যক, সধবার একাদশী, লীলাবতী, নীল-দর্পণাদির প্রথম শিক্ষায় যে-পরিমাণ সময় দেওয়া হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে কি প্রতাপ জহুরী, কি ষ্টার থিয়েটারের অধিকারীগণ ব্যবসায়ের দিক হইতে ততটা সময় দিতে হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই গিরিশবাবু ইচ্ছা-সত্ত্বেও সময়ের অভাবে সুসঙ্গত শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই কথাটার জবাব আমাদের ন্যায় বাহিরের লোকের পক্ষে দেওয়া বড়ই কঠিন; কিন্তু আমাদের মনে হয় যদি এ বিষয়ে গিরিশবাবুর প্রকৃত যত্ন ও লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে, অঙ্গুলী বক্র করিয়া ঘৃত বহিষ্করণের উপায়ের ন্যায় কোন একটা কিছুর ব্যবস্থা করা তাঁহার মত সর্ব্বেসর্ব্বা ব্যক্তির পক্ষে কোন ক্রমে অসম্ভব ছিল না।

যাক্, এখন অভিনয় শিক্ষার আর এক দিক আলোচনা করিয়া আমরা এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

এখন যে কোন নাটকের অভিনয় দেখিতে যেখানে যাই না কেন, দেখিতে পাই, অধিকাংশ অভিনেতার নিজ-নিজ ভূমিকা ভাল অভ্যস্ত হয় নাই। ইহার কারণ আমাদের বোধ হয়, নাট্য-সম্প্রদায়ের অধিকারী দিগের অর্থলালসা পরি-

তৃপ্তির দায়ে পড়িয়া ভূমিকাগুলি উপযুক্ত রূপে অভ্যস্ত হইবার পূর্বেই তাঁহাদিগকে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ইহার ফলে, অভিনেতৃগণকে দর্শকগণের বিরক্তি-ভাজন হতে হয়। অধিকারী দিগের তাড়াতাড়ি সত্বেও আমরা এ বিষয়ে অভিনেতৃ বর্গেরও কর্তব্য কর্মে কতকটা অবহেলার দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না। অপ্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিতে উপস্থিত হইলে, দর্শক সম্মুখে যে অপদস্থ হইবার আশঙ্কা, যে বিদ্রূপ সহ্য করিবার আশঙ্কা আছে, তাহা অধিকারীর নহে, অভিনেতৃবর্গের। অপ্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিতে আসিলে অভিনেতা দিগকে যে "ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা" সহিতে হয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। দর্শকেরা টিটকারী দিবেই, আবার বেতনদাতা অধিকারীও সে জন্য মহা গরম হইয়া দু-কথা শুনাইয়া দিবেন। এরূপ স্থলে বিশেষ সাবধান হইয়া পাঠ অভ্যাস করা কর্তব্য। আমরা শুনিয়াছি বিডন ষ্ট্রীটে কি নূতন কি পুরাতন যে কোন পুস্তকের অভিনয় করিতে হইলে, যতদিন না বিজ্ঞাপন (placard) দেওয়া হয়, ততদিন নাকি অভিনেতৃবর্গ পাঠ অভ্যাসে বিশেষ রূপে মনোযোগী হন না। ইহা শুনা কথা, সত্য মিথ্যা জানি না; যদি সত্য হয় তবে ইহা অপেক্ষা অভিনেতৃবর্গের নিন্দার কথা আর কিছু হইতে পারে না। অধিকারী-বর্গের অর্থলালসার জন্য তাড়াতাড়ি করা যে একটা কু-অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা থিয়েটারের বাহিরে থাকিয়াও বুঝিতে পারি। তাঁহারা মনে করেন, যেমন তেমন শিখাইয়া নূতন বহি খুলিতে পারিলেই, যখন পয়সা আসিবে, তখন বেশী বিলম্ব করিয়া ক্ষতি সহিবার প্রয়োজন কি?—ইহার অপেক্ষা তাঁহাদের বিষম ভুল আর নাই। ভাল শেখা হইলে, অভিনয় যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে, দর্শকগণ যে অধিক প্রীত হইবেন; একথা ধ্রুব সত্য। অধিকারীরা মনে করিতে পারেন, প্রবীন অভিনেতৃ বৃন্দকে বেতন দিয়া রাখিয়া ও যদি বিলম্ব করিয়া নূতন নূতন অভিনয় করিতে হয়, তবে আমাদের আর লাভ কি? তাহা হইলে ব্যবসায় চলিবে কেন? এ বিষয়ে একটা কথা তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত। প্রবীন অভিনেতারাই সকল ভূমিকা অভিনয় করেন না। নবীন অভিনেতাদের

ভূমিকা ক্ষুদ্র হইলেও শিখিতে বিলম্ব হয়; এজন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রবীণ অভিনেতাদেরও শিক্ষণীয় অনেক সূক্ষ্ম বিষয় শিখিতে বিলম্ব হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। এ বিলম্ব অধিকারীদের নীরবে সহ্য করিতেই হইবে, নতুবা ক্ষতি তাঁহাদেরই। অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অসম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষিত পুস্তকের অভিনয়ে দর্শক তৃপ্ত হন না। কাজেই ক্ষতি নিবারণের জন্য অতি অল্প দিনের মধ্যে আমার নূতন নাটকের অবতারনা করিতে অধিকারীকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়; আবার নূতন বিষয়ে খরচান্ত ও নানা উপদ্রবে পড়িতে হয়; কোন্ পুস্তক কিরূপ প্রস্তুত হইল, অভিনয়ের উপযুক্ত হইল কি না, তাহা বুঝিবার জন্য, শিক্ষায় কতদিন গিয়াছে, তাহাই গণিয়া অধিকারীরা কোন সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে অভিনয় শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করিলে, বেশী ফল পাইবেন। কোন পুস্তক কবে অভিনয়ের উপযোগী হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য একেবারে নির্বাক ভাবে অভিনয় শিক্ষকের পরামর্শের অধীন না থাকিলে, তাঁহারাই বিশেষ বিপদ গ্রস্ত হইবেন। অভিনয় শিক্ষকের প্রতি এ বিষয়ে বিশ্বাস না থাকিলে এ ব্যবসায় যে কোন অধিকারীর পক্ষে বিড়ম্বনার ব্যবসায় মাত্র হইবে। এরূপ তাড়াতাড়িতে ভাল পুস্তকও জমিতে পারে না এবং ভাল লেখকও নষ্ট হইয়া যান, নূতন লেখকের তো কথাই নাই। লেখক ও নাটক বাঁচাইয়া কাজ করা নাট্য-ব্যবসায়ীদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। "অমুকের বহি জমিল না"—একথা একবার রটিলে আর সে লেখককে লইয়া আসরে নামা দায় হইয়া উঠে! অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাতন পুস্তকের অভিনয় করিতে হইলেও, অধিকারীরা অসম্ভব তাড়াতাড়ি করেন। এমন কি চার-পাঁচ-দিনমাত্র শিক্ষা দিয়াই অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত পুস্তক খানা পুরাতন কাহার নিকট? —অবশ্য তাঁহার অভিনেতৃ বর্গের নিকট নহে—দর্শকের নিকট বটে। কোথাও অভিনেতৃ বর্গের মধ্যে দু-একজন হয়তো, সেই পুরাতন পুস্তকের পুরাতন অভিনেতা থাকিতে পারেন, কিন্তু আর সকলের পক্ষে তাহা নূতন পুস্তকের অপেক্ষা কোন অংশে নূতনত্বে হীন নহে; সুতরাং একখানা নূতন পুস্তকের

শিক্ষায় যে পরিমান সময় আবশ্যক পুরাতন পুস্তকের শিক্ষায় প্রায় ততটাই সময় লাগিবে, ইহাতে অতি মূর্খেরও সন্দেহ করা বা তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে। যদি মনে করেন, দর্শকের নিকট যে পুস্তক পুরাতন, সে পুস্তকের শিক্ষার জন্য বেশী অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া ক্ষতি গ্রস্থ হওয়া বুদ্ধি মানের কার্য নহে। ইহা স্বীকার করি, কিন্তু অসম্পূর্ণ শিক্ষায় পুরাতন পুস্তকের অভিনয় করিয়া দর্শকের পক্ষে পূর্ব দৃষ্ট অভিনয়ের তুলনায় বর্তমান অসঙ্গত অভিনয় দেখাইয়া অধিকতর বিরক্তি উৎপাদন করা কোন ক্রমেই নিজের সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে। নিজের অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া, জানিয়া শুনিয়া, নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি যাচিয়া দর্শকের অশ্রদ্ধা আনয়ন করা, কোন ক্রমেই সুযুক্তি সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আরও একটা কথা,--যে দিন কোন নূতন কি পুরাতন নাটকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেই দিনই থিয়েটারের অধিকারীরা দর্শকের সহিত ধর্মের চক্ষে (morally) সুসঙ্গত অভিনয় দেখাইতে বাধ্য বলিয়া চুক্তি করেন; সুতরাং কোন অছিলায় কোন ওজোর আপত্তিতে দর্শকের বিরক্তি ভাজন হইলে, তাঁহারা ধর্মের দৃষ্টিতে চুক্তিভঙ্গের দোষে পতিত হন। কোন ভদ্রলোক চুক্তিভঙ্গের দোষ করিলে যে লজ্জা বোধ করেন না, ইহা আমরা থিয়েটার ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাই না।

অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত পুস্তকগুলির অভিনয়ে দর্শকেরা যে নিশ্চয়ই বিরক্ত হন, তাহা অতি অল্পদিনের মধ্যে দর্শকভঙ্গ দেখিয়াই নাট্যশালার অধিকারীরা বুঝিতে পারেন। এই জন্যই পুরাতন পুস্তকের অভিনয় নূতন করিয়া করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই, আজকাল প্রত্যেক নাট্যশালাতেই দু-এক রাত্রির পরই তাহার সহিত আর একখানি অল্পপ্রাণ পুস্তকের অভিনয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। আমরা শুনিয়াছি, এরূপ প্রথার জন্য নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরাও মহা বিরক্ত। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াই এই প্রথাকে "লেজুড় জুড়িয়া দেওয়া" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ ইহার সংস্কারের কোন চেষ্টাই

করেন না! ইহা তাঁহাদেরই তাড়াতাড়ি করিয়া বহি-খোলা-পাপের প্রতিফল। অনেক সময়ে নাটক ভাল হইলেও যে দর্শক জুটে না তাহার কারণও এই।

এবিষয়ে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, স্থূলতঃ তাহার সকল কথাই বলা হইল। এক্ষণে নাট্যশালার অধিকারীগণ, শিক্ষকগণ, এবং অভিনেতৃগণ এগুলি অনুধাবন করিয়া পরস্পর কর্তব্য-চিন্তা ও সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিলে আমরা প্রীত হইব। তাঁহাদের অবিবেচনার দায়ে তাঁহাদের যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য; কিন্তু তাঁহাদের অবিবেচনায় আমরা দর্শকবৃন্দ পয়সা দিয়া, অভিনয়-দর্শনে বিমল-আনন্দ এবং সৎপ্রবৃত্তির তৃপ্তি উপভোগের প্রলোভনে যে অতৃপ্তি, যে বিরক্তি ও যে অর্থক্ষতি সহিয়া থাকি, তাহার কথা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের বিবেচনা করা একান্ত কর্তব্য নহে কি?

পোষাক পরিচ্ছদ

আমাদের নাট্যশালার পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মোটের উপর একটা কথা বলিলেই সকল কথাই সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে বলা হয় যে,—অভিনেতব্য পুস্তকের দেশকাল পাত্র বিবেচনায় আমাদের নাট্যশালাগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করা হয় না ;—কিন্তু এতবড় একটা প্রয়োজনীয় কথা এত সংক্ষেপে বলিলে, আমাদের নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ ও সাধারণ অভিনেতৃবৃন্দ, উহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে গিয়া পৌরাণিক বিষয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন কথা প্রথমেই বলা আমরা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি না ; কারণ তাহাতে অনেক উদ্ভাবনা ও কল্পনাশক্তির পরিচালনা আবশ্যক। পৌরাণিক যুগে কাহার কিরূপ পোষাক ছিল, তাহা আমরা কেহই জানি না ; দেবদেবীর প্রকৃত পোষাক যে কি হইবে, তাহাও আমরা বুঝি না। এরূপ স্থলে, আমাদিগকে কল্পনা ও উদ্ভাবন বলে, ঐ সকল পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে ; কাজেই, পৌরাণিক-বিষয়ের আলোচনা প্রথমে করিতে গেলে, তাহা ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ের অভিনয়ে পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য, কাহাকেও কিছু কল্পনা করিতে হয় না। ইতিহাসাদি খুঁজিলেই সকল সময়ের, সকল দেশের, সকল জাতির পোষাক-পরিচ্ছদের বিবরণ পাওয়া যায় ; এমনকি ছবিও পাওয়া যায় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের বঙ্গীয়-নাট্যশালায় তাহা করা হয় না। এত সহজে যে বিষয়ের সংযোগ ও সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার প্রতিও আমাদের নাট্যশালায় অতি অধিক পরিমাণে তাচ্ছিল্য করা হইয়া থাকে। এবিষয়ে আমাদের নাট্যশালায়—কি অভিনেতৃবৃন্দের, কি বেশকারীর অথবা নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের ;—কাহারই একেবারে খেয়াল নাই। পোষাক ঠিক উপযুক্ত না হইলে, অভিনয়ে কোন অভিনেতা যথার্থ ভাবোদ্রেক করিতে পারেন না, এজন্য পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম দায়িত্ব অভিনেতার।

আমাদের দেশের নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণকেই প্রত্যেক অভিনেতার পোষাক-পরিচ্ছদ যোগাইতে হয়; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রধান প্রধান অভিনেতার পোষাক, কোন রঙ্গালয় হইতে দেওয়া হয় না। সে সকল দেশে, নিজের গায়ের মাপে নিজেকে যেরূপ পোষাকে মানায়; বিষয় ভেদে সেইরূপ বিভিন্ন পোষাক, প্রধান প্রধান অভিনেতা নিজব্যয়ে করাইয়া রাখেন। সে কথা যাক, আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে নাট্যশালার অধিকারীবাই অভিনেতৃগণকে বিষয়োচিত, দেশ-কাল পাত্রানুসারে উপযুক্ত পোষাক দিতে যখন বাধ্য, তখন তাহারাই ইহার জন্য দায়ী। তৃতীয়তঃ, যিনি বেশকারী, তিনি উপযুক্ত বেশ প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য যে একান্ত দায়ী, একথা অবশ্য স্বীকার্য। আমাদের দেশে এই তিনজন দায়ী থাকিতে; এ বিষয়ে কেহই যে দৃষ্টি রাখেন না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও ক্ষোভের কথা আর কিছু নাই। যে কাজটা অতি সহজে—ছবি দেখিয়াই করা যাইতে পারে, তটুকু সামান্য পরিশ্রমও করিতে আমাদের নাট্যশালায় কাহাকেও উদ্যোগী দেখা যায় না। যে ব্যাপারটার উপর অভিনয়ের ভাবোদ্রেক সর্বপ্রধানতঃ নির্ভর করে, সেই বিষয়েই এতটা তাচ্ছিল্য করা যে কেন হয়, তাহা আমরা বুঝিয়া পাই না।

উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমান বর্ষেই (১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠমাসই) যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সময়ে ষ্টারে ও মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কোন থিয়েটারেই, জেলের কয়েদীদের পোষাক, ঠিক জেলখানার পোষাকের মত হয় নাই। কোন থিয়েটারেই কাঙালীচরণের মত জালসাজ নেটিভ-ডাক্তারের পোষাক ও এটর্ণির বাড়ীর ম্যানেজিং ক্লার্কের পোষাকও ঠিক হয় নাই। মিনার্ভার কাঙালী আবার, কেরানী পাগড়ী মাথায় দিয়া, হাফ্-চাপকান আঁটিয়া, বগলে ছাতা লইয়া, যখন ক্ষুর-ভাড়-কাঁখে, পাগড়ী বাঁধা, 'পরামাণিকের পো'র মত ঘুরিতে থাকে, তখন যে বিকট বোধ হয়, তাহা লেখায় বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। শেষ দৃশ্যেও যখন তাহার সে পোষাক ঘুচে না, তখন কি করিয়া বলিব যে, এ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি আছে!

কাঙালীচরণ যথন ডাক্তাররূপে বিনা পোষাকে আসিয়া, যোগেশের খোঙাড়ী ভাঙ্গিবার ঔষধের ব্যবস্থা করে, সে দৃশ্যে মিনার্ভায়, গিরিশবাবু নিজে যোগেশ বেশে অভিনয় করিতে ছিলেন। তিনও এই দৃশ্যে কাঙালীচরণের পোষাকের বিসদৃশতা লক্ষ্য করিয়াও সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই, কারণ দ্বিতীয় দিনও আমরা কাঙালীকে পূর্ব্ববৎ পোষাকেই অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। শেষ দৃশ্যে কাঙালীচরণ ও রমেশ একত্র উপস্থিত থাকেন; রমেশ বেশে মিনার্ভায় অর্দ্ধেন্দু বাবুকেই দুদিন দেখিয়াছি; কিন্তু কৈ তাঁহাকেও এ বিষয়ে মনোযোগ করিতে দেখিলাম না। যিনি অধ্যক্ষ, তিনি সকল ক্রটির জন্য দায়ী এবং যিনি শিক্ষক, যিনি সকল সংশোধনের জন্য দায়ী—তাঁহারা কেহই যদি এদিকে দৃষ্টি না রাখেন, তবে কে রাখিবে? শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ের ন্যায় মিনার্ভা থিয়েটারের বর্ত্তমান নূতন অধিকারীর পক্ষে এ সকল বিষয়ে অজ্ঞতা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ষ্টার থিয়েটারের 'মদনদাদার' পোষাকটা, 'আউলে সন্ন্যাসীর' ভাবে করা হইয়াছিল কেন, তাহাও বুঝা গেল না। ইতিপূর্বে 'ষ্টার থিয়েটারে' 'চন্দ্রশেখর' 'রাজসিংহ' প্রভৃতি দুই একখানা পুস্তকে অধ্যক্ষ অমৃত বাবুর খেয়াল মত দুই একবার স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে পোষাক দিবার চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর তদনুরূপ পুস্তক অভিনয়ের সময়েও সে চেষ্টার পুনরাবর্ত্তন দেখা যায় নাই। 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের পুর্বে উভয় থিয়েটারে 'রাণা প্রতাপ' অভিনয় হয়। পূর্বে যখন ষ্টার থিয়েটারে 'রাজসিংহ' অভিনয় হইয়াছিল, তখন মেবারের রাণার ও মেবারের সেনাদলের এবং মোগল বাদশাহেরও মোগল অন্তঃপুরিকাগণের যে সকল পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার হইয়াছিল, 'রাণা প্রতাপের' অভিনয়ে তাহা হয় নাই। 'রাণাপ্রতাপের' অভিনয়ে স্টারের অধ্যক্ষ, অমৃতবাবু স্বয়ং শক্তসিংহের অংশ অভিনয় করেন, কিন্তু কৈ, তাঁহাকেও এ বিসদৃশ বিশৃঙ্খলার প্রতিকারে মনোযোগী হইতে দেখিলাম না। 'রাণা রাজসিংহ' যে সূর্যবংশীয় 'সূর্যমুখী' শিরোভূষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, 'রাণা প্রতাপ সিংহ' কেন যে তাহা ব্যবহার করিলেন না, তাহা বুঝা গেল না। মিনার্ভায়, যেমন তেমন করিয়া (যাহার

যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া) একটা গেরুয়া বস্ত্র মাথায় জড়াইয়া শিশোদীয় রাজপুতের অতি সুদৃশ্য পাগড়ীর অতিমাত্র দুর্দশা করা হইয়াছিল। 'প্রতাপসিংহ' চিতোর হারাইয়া রাজবেশ ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু জাতীয় পোষাক ও রাজ চিহ্নাদি ছাড়েন নাই। ষ্টারের 'মানসিংহ' জোড়াটি পরিয়াছিলেন ভাল, কিন্তু জয়পুরী পাগড়ী যে কেন মাথায় দিলেন না, তাহা বলিতে পারিলাম না। মিনার্ভার 'মানসিংহ' নানা "রঙ্‌চঙে" কাপড় পরিয়া, রঙ্গীন ছিন্ন বস্ত্রে প্রস্তুত "গুড়িয়া পুতুল" সাজিয়া, বাহির হইয়াছিলেন! তাঁহার মাথায়, কি জানি কাহার উদ্ভট কল্পনাবলে উদ্ভাবিত, তারের ঠাটের উপর সেলাই করা, এক নূতন ধরণের শিরোভূষা ছিল; গায়ে মখমলের সল্মা-চুমকীর কাজ করা ইংরাজী লম্বা কোর্ত্তা (Long coat), পরিধানে হাফ্‌ প্যাণ্ট আর ইংরাজী হুডের নকলে, স্কন্ধে মখমলের সল্মা-চুমকীর কাজ করা, পিঠ বস্ত্রের ন্যায় একটা কে-জানে কি ধরণের ত্রিকোণ উত্তরীয়। এই পোষাকটায় মিনার্ভার ব্যয়ের পরিমাণ বড় অল্প হয় নাই এবং বেশকারী মহাশয়ের মস্তিষ্ক চালনাও বড় অল্প হয় নাই; কিন্তু তবু আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, ইহা জয়পুর আম্বেরের অধিপতি রাঠোর মান সিংহের পোষাক তো হয়ই নাই, অধিকন্তু ইহা কোন দেশেরই পোষাক হয় নাই! অধিকারী পাঁড়ে মহাশয়, অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি না করিয়া যে জমকালো পোষাকে মানসিংহ সাজাইয়াছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য দর্শকের কোন আগ্রহ ছিল না, বরং 'মানসিংহের দেশকাল পাত্র উপযোগী পোষাক, তাঁহার নিজ প্রতি মূর্ত্তি হইতে প্রস্তুত করাইয়াদিলে, অনেক কম খরচে উপযুক্ত পোষাক হইত এবং লোকে দেখিয়াও তৃপ্ত হইত। *

* আমরা জানি বিশ্ব কোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের নিকট মানসিংহের ছবি আছে। পাঁড়ে মহাশয় তাঁহার নিকট চাহিলেই পাইতেন। অন্ততঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের পোষাক পরিচ্ছদের জন্য নিজে নিজে কল্পনা খাটাইয়া দরজীর কাঁচির শরণাপন্ন না হইয়া, যদি প্রত্নতত্ত্ব বিদগণের আবিষ্কৃত ছবি, প্রস্তর মূর্ত্তি প্রভৃতির শরণ লয়েন, তাহা হইলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বেশী প্রশংসার্হ হন।

নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বলিতে পারেন, জমকালো পোষাক পরাইলে দর্শকেরা চমৎকৃত হইয়া প্রশংসা করেন। ভালকথা, জমকালো পোষাক দিতে কেহ বারণ করিতেছে না। দেশ-কাল-পাত্রানুসারে, পোষাক যত জমকালো করিতে পারা যায়, করা হউক, কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাহা না করিয়া, যাহার যাহা নহে, তাহাকে যদি তাহাই দিয়া জমকালো করিয়া সাজান হয়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি না করিব কেন? জমকালো হইবে বলিয়া 'ক্লাইভকে যদি মোঘল বাদ্শার পোষাক দেওয়া যায় তবে কেমন দেখিতে হয়? ষ্টার থিয়েটারে 'রাজসিংহের' অভিনয়কালে 'জেবউন্নিসাবেগম' 'উদীপুরীবেগম' প্রভৃতির পায়জামা, আঙ্গিয়া, বালাপোষ, প্রভৃতি গৃহব্যবহার্য পোষাকের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রাণাপ্রতাপের অভিনয়কালে আকবর বাদশার অন্তঃপুরিকাগণের পোষাকাদিতে সেরূপ দৃশ্যভেদে পোষাকভেদ যে কেন প্রদর্শিত হইল না তাহা বুঝিলাম না। ষ্টারের অধ্যক্ষ মণ্ডলীর কোন পরিবর্তন হয় নাই, অথচ একই প্রকার বিষয়ের অভিনয়ে, এক রকম ব্যবহারের পুনরাবর্তন করা হয় না কেন, তাহা আমারা ভাবিয়া পাইলাম না। মিনার্ভায় "দুর্গাদাস" অভিনয়ে আওরঙ্গজেবের মহিষী ও পৌত্রীকে, বিলাতী বলড্রেস-ভাঙা ঘাগড়া ও পেটিকোট পরিতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি! কলিকাতায় মুসলমানী নর্তকীদিগকে যে পেশোয়াজ পরিয়া সকলে নাচিতে দেখেন, উহাই যে মোগল বাদশার অন্তঃপুরিকাগণের ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী মুসলমান পরিবারের ব্যবহার্য পোষাক, এ কথা কে না জানেন? কিন্তু কোন নাট্যশালার কোন অধ্যক্ষ বা বেশকারীকে সে পোষাক ব্যবহার করিতে দেখি না। 'দুর্গাদাসে' শম্ভুজী প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয়-গণের পোষাকও ঐরূপ একটা বিজাতীয় ভাবাপন্ন দেখিয়াছি। ষ্টারের পদ্মিনীতে আমরা রাজপুত ও পাঠানের উপযুক্ত বেশভূষা দেখি নাই।

বঙ্গীয় নাট্যালয়ের এই পোষাক নির্বাচনের ভার সাধারণতঃ একজন সামান্য ব্যক্তির উপর থাকে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, পোষাকের বিভিন্নতার প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান, সে সকল ব্যক্তির কাহারও নাই। যাঁহারা পোষাক-

পরিচ্ছদ তুলিতে, পাড়িতে, রাখিতে, ভাঁজ করিতে, শুকাইতে ও কোন পুস্তকের কোন অভিনেতার কি পোষাক, ইহা মনে করিয়া বাছিয়া দিতে পারেন এবং দ্রব্যাদির উপর একটু যত্ন লয়েন, তাহারাই আমাদের নাট্যশালাগুলিতে উপযুক্ত বেশকারী। ইহার উপর যিনি অল্প বিস্তর সেলাই করিতে, মুক্তামালা, ঘুঙুর ও পীত বর্ণের তবকীদানার গহনা গাঁথিতে পারেন, তাঁহার কৃতিত্বের, গৌরবের আর অবধি থাকে না। এই সকল বেশকারীরাই আবার অনেকে, নূতন নূতন ছাঁটকাটের পোষাকের উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। এরূপ উদ্ভাবনী শক্তি অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু সে উদ্ভাবনা, দেশ কাল পাত্রোচিত পোষাকের জ্ঞান না থাকায়, কোন কাজেই আসে না। তাহা কেবল সম্প্রদায়ের অধিকারীর অনর্থক বিপুল অর্থব্যয় ও দর্জির বিস্তর লাভ করাইয়া দেয়। এই সকল বেশকারীদের ইতিহাস পড়া নাই, দেখা নাই। এমন কি বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন কালের পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য কি, বিশেষত্ব কি, উপাদান কি, তাহা জানা নাই, জানিবার উপায়ও নাই, জানিবার চেষ্টাও নাই, জানিবার আবশ্যকতা যে আছে—তাহাও ইহারা বুঝেন না। গ্রন্থকার অধ্যক্ষ বা শিক্ষকগণও তাহা ইহাদের শিখাইয়া দেন না। এসিয়াটিক সোসাইটির যত্নে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টায়, আজকাল কোনও কালের কোন দেশের পোষাক-পরিচ্ছদের আদর্শ পাইবার খুব বেশী অভাব আর নাই। ইংরাজ রাজ নিজ শাসনাধিকৃত ভারতবর্ষের সকল জাতিরই আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির এত বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন যে, যে ইচ্ছা করিবে, চেষ্টা করিবে, সেই তাহা হইতে সকল তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিবে। বেশকারীদের এই সকল শিক্ষাহীনতা বা বুদ্ধির অপরিস্ফুটতার জন্য, আমরা আমাদের দেশের নাট্যশালার ম্যানেজার ও 'বিজনেস ম্যানেজার' নামক কর্মাধ্যক্ষগণকেই দায়ী বলিয়া মনে করি। কেবল টাকাআনাপাই-এর হিসাব আর অভিনয় ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখাই যদি এই সকল ম্যানেজার ও বিজনেস ম্যানেজারের কার্য হয়, তাহা হইলে 'পট-পরিচ্ছদাদির পরিদর্শক' (Greenroom

(superintendent) নামক আর একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী রাখা আবশ্যক। শুনিয়াছি, মিনার্ভা থিয়েটারে নাকি এইরূপ দুই তিন জন কর্মচারী আছেন। তাঁহাদের পট-পরিচ্ছদাদিতে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না, তাহা আমরা জানি না; বরং তাহা নাই বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য; কারণ, মিনার্ভা থিয়েটারে এ পর্যন্ত আমরা ইহার কোন পরিচয়ই পাই নাই, অধিকন্তু মিনার্ভা থিয়েটারে পট-পরিচ্ছদাদিতে বিপুল অর্থব্যয় সত্ত্বেও এই সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা দুর্দশাই দেখিতে পাই। ইহার উদাহরণ আমরা একখানা সামাজিক নাটক ও একখানা অর্দ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের পরিচ্ছদ ব্যবস্থা হইতে দিতেছি। 'বলিদান' নাটকে করুণাময় বসুর বাড়ীর চাকরানী যে রমণী সাজে, সে যে ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহে তাহাতে তাহাকে মেদিনীপুর বা বাঁকুড়া জেলার অধিবাসিনী নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি, কিন্তু সে কাঁচুলি পরিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় কেন? এ বেশ কে তাহাকে দেয়? আজকাল এই পূর্ণ সভ্যতার দিনে কলিকাতাতেও কোন বড়লোকের বাড়ীর ঝিও তো কাঁচুলী গায়ে দেয় না। মিনার্ভার 'বেশকারীদাদা' কি 'নেপথ্য-পরিদর্শক মহাশয়' (Greenroom superintendent) কেহই ত এটা যে অন্যায় তাহা বিবেচনা করেন নাই। কোন কোন দৃশ্যে, দুলালচাঁদের পোষাকের অতীব ব্যাভিচার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, অথচ তাহার পোষাকগুলি দামী। 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ে মিনার্ভায় পোষাকের ব্যাভিচার যত দেখা গিয়াছে এত আর কোথাও নহে। প্রতাপাদিত্য বাঙালী, যশোহরের রাজা, আমাদেরই মত লোক—আমাদেরই মত বাঙালী—আমাদেরই মত তাহার আচার ব্যবহার; তিন শত বৎসর পূর্বেও সে আচার ব্যবহারে আরও কত সামাজিক নিষেধ বিধির প্রাবল্য ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়; কিন্তু মিনার্ভার "বসন্তরায়" "প্রতাপ" যখন অন্তঃপুরে শয়ন-গৃহে স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের সহিত আলাপে নিযুক্ত তখনও তাহাদের ধড়াচূড়া প্রভৃতি দরবারী পোষাক যে কেন থাকে তাহা ভাবিয়া পাই না। বসন্তরায়ের রাণীর সকল সময়ে বারাণসী শাড়ী আর ইংলিশ-জ্যাকেট পরিবার হেতু কি, আমরা

ভাবিয়া পাই না। এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া আর কত উল্লেখ করিব? এক্ষণে সাধারণ ভাবে কতকগুলি কথা বলিয়া পোষাকের কথা শেষ করিতে চাহি।

বঙ্গীয় নাট্যশালার বেশকারীদের অল্পদৃষ্টি ও অল্পজ্ঞান অনুসারে এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে যে, আবুহোসেনের ইয়ার সাজিতে হইলে যে পোষাক পরিলে চলে, মোগল-দরবারের আমীর-ওমরাহ সাজিতে হইলেও প্রায় সেই পোষাকই চলিবে, কেবল তাহার উপর কতকগুলো চুমকীর কাজ থাকিলেই হইল! এক "মোগলাই মোড়েসা" হইলেই সর্বদেশের সকল প্রকার মুসলমানের শিরোভূষা হইয়া থাকে! লম্বা জামার উপর যেমন তেমন একটা 'সদরী' হইলেই ভদ্র মুসলমানের পোষাক হয়! মুসলমানী মহিলার পোষাক সম্বন্ধে রাজমিস্ত্রি দলের রেজামাগীদের পোষাকই আদর্শ—তাহাতে চুমকী লাগাইলেই কাজ চলিয়া যায়। বাদশাহ সাজিতে হইলে মোড়েসা, পায়জামা, মোজা, আর চাপকান হইলেই চলে—বিশেষত্ব চুমকীতে আর সল্‌মায়। আজ কাল ইংরাজী হুডও মোগল বাদশাহের ব্যবহার্য হইয়াছে, বঙ্গীয় নাট্যশালার এমনই প্রভাব! মুসলমান রাজ-পুত্র ইংরাজী কোট ও হাফ প্যাণ্ট পরেন, মোজা পায়ে দেন আবার হিন্দুর দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পিঠবস্ত্রও গায়ে দেন। রাজা ও সেনাপতি প্রভৃতির যুদ্ধের পোষাক আর দরবারী পোষাক স্বতন্ত্র করা হয় কেবল হাফ্ প্যাণ্ট আর অস্ত্রশস্ত্রে; তা হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন—কিছু বিচার নাই; কিছু প্রভেদ নাই।

হিন্দু রাজার জাতিবিচারের আবশ্যক করে না, দেশ-বিচারের আবশ্যক করে না; তিনি মুসলমান বাদশাহের পোষাক পরিয়া পিরালী পাগড়ীতে শির-পেঁচ কলগী লাগাইয়া মাথায় দিলেই তাঁহার জাতি বাঁচিয়া যায়।

মহিষীর পোষাক—বারাণসী সাড়ী, সিল্কের ইংলিস জ্যাকেট আর ডাকের সাজের মুকুট ভিন্ন বঙ্গীয় নাট্যশালায় আর কিছুই উপকরণ নাই।

রাজকন্যার পোষাকটায় সাধারণতঃ ঘাগড়া, জ্যাকেট আর ওড়না থাকে, তা তিনি যে দেশের লোকই হউন না কেন। বর্দ্ধমানের বাঙালীরাজা বীরসিংহের

কন্যা বিদ্যাকেও ঘাগরা ওড়না ও আঙ্গিয়া আঁটিয়া খোট্টানী সাজিতে হয়—ইহার অপেক্ষা পরিতাপের কথা আর কি বলিব?

এই যে সকল পোষাকের কথা বলা গেল, বঙ্গীয় নাট্যশালার 'বেশকারীদাদার' কৃপায় এইগুলিই এখন আদর্শ (standard) দাঁড়াইয়াছে। ইহাই এখন প্রতি নূতন পুস্তকে, বেশকারীর কল্পনাবলে আর দরজীর কাঁচির সাহায্যে নানা উদ্ভট আকার ধারণ করে, অথচ যাহা আবশ্যক তাহা কখনও হয় না।

আর একটা কথা এইখানে বলিব, এক প্রকারের বেশভূষায় কতকগুলি ব্যক্তি সাজিতে হইলে, বঙ্গীয় নাট্যশালায় অতীব তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়। সৈন্যদল, প্রতিহারিদল, সভাসদগণ, নাগরিকগণ এবং সখীগণ সাজিতে হইলে, অনেক স্থলে পোষাকে কোন আদর্শ রাখা হয় না। সখীগণের বেশভূষাটা আমাদের নিকট বড়ই বিসদৃশ মনে হয়। সখী বলিলেই, আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালায় একদল নর্তকীমাত্র বুঝিয়া থাকি। নর্তকী ও সখীতে যে কিছু প্রভেদ আছে, বঙ্গীয় নাট্যশালায় অধ্যক্ষগণ, বেশকারীগণ, এমন কি অনেক নাটক লেখকও তাহা বুঝেন না। অনেক নাটকেই দেখা যায়, যেখানে সখীগণ উপস্থিত, সেইখানেই—সময় নাই, অসময় নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, প্রয়োজন নাই, অপ্রয়োজন নাই—বুঝিতে হইবে—তাহাদিগকে নাচিতে হইবে। বঙ্গীয় নাট্যকারগণের হাতে পড়িয়া, বঙ্গীয় নাট্যশালার অর্থৈককাম, কর্তৃপক্ষগণের প্রয়োজন বশতঃ সখীর দল মারা গিয়াছে! তাহাদিগকে হাসির সময় নাচিতে হয়, ক্রন্দনের সময় নাচিতে হয়, আনন্দের সময় নাচিতে হয়, শোকের সময়ও নাচিতে হয়, ঘরে নাচিতে হয়, বাহিরে নাচিতে হয়, বাগানে নাচিতে হয়, বাজারেও নাচিতে হয়; দুপহরে, সন্ধ্যায়, সকালেও নাচিতে হয়। বাঙ্গালা নাটকে নাচ বৈ তাহাদের কার্য নাই, গান বৈ তাহাদের কথা নাই, বাঙ্গালা নাট্যকারগণও তাহাদের অন্য অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন, কাজেই বেশকারীরা রঙ্গালয়ে সখীরদল সাজাইতে হইলেই, দায়ে পড়িয়া যেন একদল বল-ড্রেস-বিভূষিতা স্ত্রীলোক সাজাইয়া রাখিতে বাধ্য হন। এই নাচের পোষাক ব্যতীত সখীদের অন্য-

পোষাকও নাই। আজকাল সে পোষাকও ইংরাজী নাচের পোষাকের অনুকরণে প্রস্তুত হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়-ভেদে, দেশ-ভেদে, জাতিভেদে নর্তকীর পোষাকের তারতম্য কিছুই রাখা হয় না। যে ধরণের ছাঁট কাটের পোষাকে 'রিজিয়ার' সখীরা নাচে, সেই ধরণের পোষাকেই 'সিরাজ-মীরকাসিমের' সখীরাও নাচে। আবার 'আলিবাবা'র সখীদেরও সেই একই ধরণের পোষাক। পোষাক সম্বন্ধে আমরা যে সকল ইঙ্গিত করিলাম, তাহা হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অনায়াসেই বুঝিবেন যে, স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করিয়া পোষাকের ব্যবস্থা করিলে, কত বিসদৃশই হয়। মনে ভাবুন দেখি, তিন শত বৎসর পূর্বের সময়ে, 'যশুরে বাঙ্গাল' রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে যদি বসন্তরায়ের রাণীকে হাফ্ হাতা ভিক্টোরিয়ান জ্যাকেট পরিয়া নথ নাড়িতে দেখা যায়, তাহা সোনার পাথর বাটীর মত উদ্ভট বোধ হয় না কি?

এই সমস্ত পোষাকের বিসদৃশতা আরও বেশী বোধ হয়; যখন পৌরাণিক বিষয়ের অভিনয়ের ব্যাপার দেখি। 'জনা' নাটকের প্রধান দৃশ্যে মুসলমানী চাপকান, চোগা, পায়জামা অথবা ইংরাজী হাফ্প্যাণ্ট পরিয়া আর ক্রাউন মাথায় দিয়া যখন অগ্নিদেবকে কল্পতরু হইয়া বর দিতে দেখি, তখন আমাদের মনে হয়, আমরাও এই ঠাকুরটির কাছে একটা বর লই যে, তিনি দয়া করিয়া সর্বাগ্রে বঙ্গীয় নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের রুচির মুখে লাগিয়া যান! যখন কলিঙ্গদেশান্তর্গত মাহিষ্মতী রাজমহিষী জনাকে ইংরাজী পেটিকোট ঘাগরার আকারে ঈষৎ পরিবর্তিত ইংরাজী গাউন পরিয়া, ক্রাউন মাথায় দিয়া, কতকটা এলিজাবেথ সাজিয়া বক্তৃতা করিতে দেখি, তখন মনে যে কি বিরক্তি অনুভব করিতে হয় তাহা কিরূপে বর্ণনা করিব ভাবিয়া পাই না। যখন দেখি 'জনা'র শ্রীকৃষ্ণ পীরালী পাগড়ীর উপর ময়ূরপাখা লাগাইয়া অলকাতিলক পরিয়া, বৈষ্ণবী বেশিনী স্বাহা ও মদন মঞ্জরীর গান শুনিতেছেন, তখন মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ পীরালী পাগড়ীটা ফেলিয়া দিয়া যদি একটা বিলাতী ষ্ট্র-হ্যাটের উপর ময়ূর পাখা গুঁজিয়া লইতেন, তাহা হইলেও বঙ্গীয় নাট্যশালায় বিনা ওজরে বাহবা লইয়া যাইতে পারিতেন।

পোষাক-পরিচ্ছদের আর একটা দিক আছে, ইংরাজীতে তাহাকে 'Make-up' বলে, আমাদের রঙ্গালয়ে ইহার বাংলা নাম কিছু হইয়াছে কি না জানি না। এই 'মেকাপের' গুণে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও গৌরবর্ণ পুরুষ, যুবকও বৃদ্ধ, বৃদ্ধও যুবা সাজিতে পারে, ইহারই কৌশলাদি যে ভাল জানে, সেই প্রকৃত বেশকারী পদবাচ্য। অভিনেতৃবর্গেরও এ বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আমাদের রঙ্গালয়ে এ বিষয়টার কোন প্রয়োজনীয়তা কেহ বুঝে না। এখানে সকলেই জানে, সকলকে রঙ্ মাখিতে হইবে অর্থাৎ সকলকে ফুটফুটে গৌরকান্তি ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু কি কৌশলে তাহা হয়; তাহা কাহারও জানা নাই। পেউড়ী, সিঁদুর, সফেদা, ও খড়িমাটি মিশাইয়া মুখে মাখিলেই সকলেই দিব্যকান্তি লাভ করিবে, এই বিশ্বাস। গাত্রবর্ণ অনুসারে, কাহার পক্ষে কোন জিনিস কি পরিমাণ মিশাইলে, 'বাঞ্ছিত বর্ণ' লাভ হইবে তাহা কেহই জানে না; বেশকারীরাও জানেন না, অভিনেতৃবৃন্দও নহে। যুবামুখে কোথায় কি রঙ দিলে, কোথায় কি রঙের কিরূপ রেখা টানিলে তাহা বৃদ্ধের মুখ হইবে, বঙ্গীয় নাট্যশালায় কোন অভিনেতা বা কোন বেশকারী তাহা জানেন না। যাত্রার দলের সজ্জার অনুকরণে একটা বুড়ার চুল মাথায় দিয়া ভ্রূতে এবং গোঁফে খড়ি লাগাইলেই বুড়া সাজা যায়, ইহাই আমাদের নাট্যশালায় বিশ্বাস। বুড়া সাজিতে হইলে যে, যুবকের মুখেও বুড়ার মুখের মত গাল তুবড়াইতে হইবে, চোখের কোণে, কপালে, কোঁচকা দেখাইতে হইবে, রগে শিরতোলা দেখাইতে হইবে—তাহা না হইলে যে, বুড়ার মুখই হইবে না, তাহা কেহ বুঝে না, ভাবে না, জানে না! 'মেকাপের' (বর্ণসজ্জার) গুণেই সে সকল যে দেখাইতে পারা যায়, তাহা আমাদের নাট্যশালায় কেহই জানেন না। এই সকল পরিবর্তন না দেখাইলে, অভিনেতার ভাব-বিকাশে যে বিশেষ বাধা পড়ে, তাহাও কেহ ভাবেন না। সেদিন মিনার্ভায় যে 'প্রফুল্ল' অভিনীত হইয়া গেল, তাহাতে একটি যুবতীকে 'উমাসুন্দরীর' ভূমিকা আর অর্দ্ধেন্দুবাবুকে 'রমেশের' ভূমিকা লইতে হইয়াছিল। বর্ণসজ্জার প্রকৃত ব্যবস্থার অভাবে, এই দুই মূর্ত্তি যে ভাবে দর্শকের

দৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা কোন ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিব না। গিরিশবাবু ৬৫।৬৬ বৎসরের প্রাচীন পুরুষ। গিরিশবাবু সেদিন 'যোগেশচন্দ্র' সাজিয়া ছিলেন। তিনি কোন বর্ণসজ্জার সাহায্য লইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবকের মূর্তিতে প্রকাশিত হন নাই—(আমাদের মতে তাহা হওয়া উচিত ছিল, কারণ যোগেশের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ স্কুলের বালকমাত্র) সুতরাং যে যুবতীকে ৬৬ বর্ষ বয়ঃক্রমের যোগেশের মা সাজিতে হইয়াছে, তাহাকে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা সাজাইয়া দেখাইতে না পারিলে, দর্শকের সম্মুখে সে সম্পূর্ণ ভাবোদ্রেক করিয়া অভিনয় করিতে সক্ষম হইবে কিরূপে? যুবতীর ঘন-মেঘ-কৃষ্ণ-কেশ-কলাপে মুঠাখানেক খড়ির গুড়া ছড়াইয়া দিলেই কি আশী-বর্ষের বুড়ীর সাজ হয়? অর্দ্ধেন্দুবাবুর বয়সও গিরিশবাবুর অনুরূপ, তায় তাঁহার সমস্ত চুল পাকিয়া গিয়াছে, গণ্ড-মাংস লোল হইয়াছে। তাঁহাকে বড় জোর ৩০।৩৫ বৎসর বয়সের যুবক এটর্ণী 'রমেশ' সাজিতে হইয়াছিল; কারণ আমরা জানি, প্রফুল্ল রমেশের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী নহে; অতএব এরূপ বর্ণসজ্জার ব্যবস্থা সেদিন না-থাকায় আর তাহার উপর একটা পেটে-পাড়া কাঁচাচুলের বাবরীচুল এবং লম্বা গোঁফ পরায় অর্দ্ধেন্দুবাবুর চেহারা যেন হাটখোলার মহাজনপটির বাঙাল দালালের মত হইয়াছিল! কিন্তু অমৃতবাবু ষ্টারে যে সাজে 'রমেশ' সাজিয়া ছিলেন, তাহা সাজের গুণে অতি সুদৃশ্য হইয়াছিল। তিনি অর্দ্ধেন্দুবাবুর প্রায় সমবয়স্ক, অর্দ্ধেন্দুবাবুর ন্যায় তাঁহারও সমস্ত চুল পাকিয়া গিয়াছে, মুখে বয়সোচিত শিরা ও রেখা দেখা দিয়াছে, গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু দিব্য সিথা-কাটা ইংরাজী ফ্যাসানে ঘাড়-ছাঁটা একটি কোঁকড়া চুলের আবরণে, কার্তিকদাদার ফ্যাসানের একটি গোঁফে এবং অধরের নিম্নভাগে ছোট একটু দাড়িতে, তাহাকে যেন ২৮।২৯ বৎসরের ছোকরা করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙলা নাট্যশালায় এত সুন্দর 'মেকাপ' আমরা এক 'ম্যাকবেথের' অভিনয় ব্যতীত আর কোথাও দেখি নাই। আজকাল থিয়েটারে সোঁটা-সোঁটা কোঁকড়া লম্বাচুলের বাবরীর ব্যবহার বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টারের অমৃতলাল মিত্র এইরূপ বাবরী মাথায় দিয়া 'প্রতাপাদিত্য'

সাজিয়াছিলেন—তাহার উদ্দেশ্য—তাঁহায় বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক কম বয়সের যুবক 'প্রতাপাদিত্য' সাজিতে হইয়াছিল। কিন্তু তদবধি যে কোন যুবক প্রতাপ সাজিবে, সেই যদি ঐ চুল ব্যবহার করে, তবে কি বিষম বিকৃত দেখিতে হয়, তাহা আমাদের রঙ্গালয়ে কেহ বুঝে না। তারপর, ঐ চুল কোন আকৃতির মুখে মানায়, তাহা দেখা আবশ্যক। আমরা যত দেখিয়াছি, তাহাতে উহা গোলাকৃতি মুখে কিছুতেই মানায় না। কিন্তু রাজপুত্র বা নায়ক উপনায়কের ভূমিকা যাঁহারা লন, তাঁহারাই যেন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বলে ঐ চুল পরিয়া আবির্ভূত হন। ইহাতে সময়ে সময়ে এক এক ব্যক্তিকে এমন কর্কশ দর্শন করিয়া তুলে যে, তিনি নায়ক অভিনেতা হইলেও, তাহার মুখের দিকে চাহিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর এক কথা, এই চুলটা ইংরাজ বালিকার ব্যবহার্য বস্তু, এগুলা আমাদের দেশের পুরুষগুলা কেন যে ব্যবহার করে তাহাও বুঝি না। কিছু একটা সাজিতে হইলেই, আজকাল, সকল অভিনেত্রীকেই জোড়া ভ্রূ আঁকিয়া বাহির হইতে দেখা যায়। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। অধিকাংশ মুখে জোড়া-ভ্রূ আঁকিলে বোধ হয় যেন কপাল ও চোখ-নাকের মাঝখানে একটা তলোয়ারের চোট লাগিয়াছে। কাহারও মুখে বোধ হয় কপালের দিকে ৬ ইঞ্চি গর্ত হইয়া গিয়াছে। কাহারও চক্ষু যেন কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইত্যাদি।

পোষাক-পরিচ্ছদ ও 'মেক্-আপ' সম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহা হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিবেন যে, এগুলির জন্য কেবল কল্পনা সাহায্যে, বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া, পোষাকের নামে কতকগুলা কাটা কাপড়ের স্তূপসঞ্চয় করা অপেক্ষা ইতিহাস দেখিয়া, ছবি খুঁজিয়া, জানিয়া-শুনিয়া, আবশ্যক মত পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করানই একান্ত আবশ্যক। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আরও বুঝিবেন, এ বিষয়ে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের অজ্ঞতাই বেশী অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও এগুলি বেশকারীর স্বাধিকারের কথা, কিন্তু যখন আমাদের দেশে তেমন অভিজ্ঞ বেশকারী নাই, তখন নাট্যশালার অধ্যক্ষগণই স্বীয় আদেশ

বলে এ সকল বিষয়ের উপযুক্ত আয়োজন কেন যে বেশকারীর দ্বারা করাইয়া লয়েন না, তাহা বুঝি না। মিনার্ভার অধ্যক্ষ গিরিশবাবু ও শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুবাবুকে আমরা এ বিষয়ে বেশী অমনোযোগী দেখি।* ষ্টারের অধ্যক্ষ অমৃতবাবুকে আমরা এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অবহিত হইয়া কার্য করিতে দেখি, কিন্তু তাহা যে কেন স্থায়ী হয় না তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। এ বিষয়ে নাট্য সম্প্রদায়ের অধিকারীদিগকে বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ তাঁহারা এদিকে খরচপত্র করিতে কোন কাতরতা প্রকাশ করেন না, অথবা যাঁহারা অধ্যক্ষ, তাহাদের দেখিবার দোষে, তদারক তদ্বিরের দোষে, অমনোযোগ বশতঃ, এই যে দোষগুলি অহঃরহ ঘটিতেছে, ইহার প্রতীকার কি হইবে না? ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকেও ভাবাবেগ আনয়নের জন্য চন্দ্রশেখরের আঙ্গিনায় সখী সাজিয়া সংকীর্তন করিতে হইয়াছিল। অতএব অভিনেতব্য পুস্তকের ভাষার কৌশল অপেক্ষাও উপযুক্ত পোষাক যে অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা আর গিরিশবাবুর ন্যায় বিজ্ঞদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

---

* যখন 'বাণীতে' এই প্রবন্ধ প্রকশিত হইয়াছিল, তখন...... গিরিশবাবু মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার পর কহিনূর থিয়েটারে গিয়াছিলেন। এ পরিবর্তনের জন্য আমাদের বক্তব্যের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। গিরিশবাবু কহিনূরে গিয়াও সেই পুরাতন চালেই চলিতেছেন, কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন করা আবশ্যক বলিয়াই মনে করেন নাই। এখন আবার মিনার্ভায় আসিয়াও পূর্ববৎ নিয়মেই নিশ্চেষ্টভাবে কেবল নামমাত্র 'অধ্যক্ষ' বলিয়া ছাপাইয়া দায়িত্বের সমস্ত কলঙ্ক মাথায় লইয়া কার্য নির্বাহ মাত্র করিতেছেন। ষ্টারে অমৃতবাবুও অচল-অটল। কেহই কিছুরই পরিবর্তন করিতে চেষ্টাও করিতেছেন না। দেখিতেছি আমাদেরই 'অরণ্যে রোদন' হইতেছে। আর অর্দ্ধেন্দুবাবু—হায়! তিনি তো এখন স্বর্গগত।

—ঃ দৃশ্যপটাদি ঃ—

(৪)

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছি যে, দেশ-কাল-পাত্রোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ না থাকায়, বঙ্গীয় নাট্যশালায় ভাব ফুটাইবার যেমন ব্যাঘাত হয়, দেশ-কাল-বিষয়োচিত দৃশ্যপটের ব্যবস্থাও হয় না বলিয়া ভাবশুদ্ধ অভিনয়ের ঠিক তেমনিই ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বঙ্গীয় নাট্যশালায় দৃশ্যপটের বিসদৃশতা প্রথম দৃষ্টিতে পড়ে—পার্শ্বপটে (wings) অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখিয়াছি, মূল পটখানির সহিত তাহার পার্শ্বপটের দৃশ্যের মিল থাকে না। কক্ষের দৃশ্যে এই অসামঞ্জস্য অতি স্পষ্ট দৃষ্টিতে পড়ে। কক্ষের প্রধান পটখানিতে যে ভাবে প্রাচীর গাত্র এবং তাহার জানালা-দরজাদি আঁকা থাকে তাহার পার্শ্বপটে যে সকল দৃশ্যের সহিত মিলাইয়া উপযুক্ত বিষয়ের অংশ থাকে না। এমনও দেখা যায় যে মূল-পটের প্রাচীরের সহিত পার্শ্বপটের প্রাচীরের গায়ের রঙ্‌ পর্যন্ত মিল থাকে না। দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম যে না হয় তাহা নহে। সে সকল স্থলে দৃশ্যটি অতি মনোরম হয়। ষ্টার থিয়েটারে এ বিষয়ের উন্নতি যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। ষ্টারে যতগুলি কক্ষের দৃশ্য আছে সেগুলির অঙ্কনকৌশল প্রশংসার যোগ্য। ষ্টারের প্রত্যেক কক্ষটির তিন দিকের প্রাচীর পটে আঁকিয়া দেখানো হয়। ইহাতে 'গৃহমধ্য' বুঝিবার পক্ষে দর্শকের বড় সুবিধা হয়। মূল পটখানির উভয় পার্শ্বে যে দুইখানি সংযোজক পট দিয়া ঘরের দুই পার্শ্বের দুইটি কোন এবং প্রাচীর দেখান হয়, তাহাতে ঘরের মধ্যস্থিত অভিনেতৃবর্গের সহিত অভিনয়াংশের বেশ মিল হইয়া থাকে, এজন্য ষ্টার থিয়েটারে কক্ষের দৃশ্যগুলি বড়ই সুন্দর হইয়া থাকে। এই একটি মাত্র দৃশ্যের উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া ষ্টার থিয়েটার সকল পুস্তকের সমস্ত কক্ষের দৃশ্যের বেশ সদ্ভাব উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মিনার্ভা থিয়েটারে ইদানীন্তন যে কক্ষের দৃশ্যে গৃহসজ্জা হিসাবে গা-আলমারীতে বাসন আঁকা আছে, প্রাচীর গাত্রে ব্র্যাকেটের উপর কালীঘাটের পুতুল আঁকা

আছে। সেই খানিই সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ষ্টারের কক্ষ-দৃশ্যগুলির ন্যায় ঘরের তিন দিক দেখাইয়া সংযোজক দৃশ্যপট সহ অঙ্কিত হইয়াছে। মিনার্ভায় এরূপ সম্পূর্ণ দৃশ্যপট আর নাই। ষ্টার ভিন্ন অন্যত্র কক্ষের দৃশ্যপট দেখাইতে হইলে, কোন খানির দুইখানি মাত্র পার্শ্বপট দেখান হয়। তাহা প্রধান পটের সহিত এক রেখায় অঙ্কিত হয় বলিয়া বুঝা যায় না যে, সে অংশ দুইটি ঘরের কোন অংশ। প্রাচীরের গভীরতার দিকে কোন দরজা-জানালা থাকে না, কিন্তু এই দুই কক্ষপটে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের (perspective drawing এর) নিয়ম না জানিয়া প্রশস্তভাবে যে জানালা দরজা আঁকা হয়, তাহার কোন অর্থই হয় না। কক্ষের পার্শ্বপটে এরূপ প্রশস্ত ভাবে দরজা-জানালা আঁকার প্রথা আমাদের মনে হয়, রঙ্গমঞ্চের চিত্রকরগণের একটা বিষম ভুল ধারনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। রাজসভা বা দরবার গৃহ আঁকিতে হইলে, বঙ্গীয় নাট্যশালায় তাহার পার্শ্বপটগুলিতে কতকগুলি মহামূল্য পরদা বেষ্টিত থামের সারি আঁকা হয় আর রাজসভার মূল পটখানিতে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের নিয়মে কতকগুলি থাম ও খিলানের সারি আঁকিয়া দেখান হয়। পার্শ্বপটের থামগুলি এই মূলপটের থামগুলির সঙ্গে মিলান থাকে। পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের কৌশলে অঙ্কিত এইরূপ দৃশ্যপটে রাজসভাটিকে অতিদীর্ঘ গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের বিশ্বাস কক্ষের দৃশ্যের সহচর যে সকল পার্শ্বপট প্রশস্তভাবে অঙ্কিত হয় তাহা এই রাজসভার স্তম্ভমালার দৃশ্যপটের কল্পনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। নাট্যশালার চিত্রকরেরা এটুকু বুঝেন না যে, রাজসভায় সভাগৃহের দীর্ঘত্ব ও গভীরত্ব প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য, আর সেই জন্য তাহা স্তম্ভসারি দ্বারা দেখান হয় ; কিন্তু কক্ষমধ্য দেখাইতে এরূপ দীর্ঘত্ব বা গভীরত্ব দেখাইতে পারিলে, ঘরের কল্পনা সহজে করা যায় আর তাহার জন্য পার্শ্বপটের অঙ্কন ব্যবস্থা অন্যরূপ হওয়া আবশ্যক। তার পর প্রসঙ্গত আমরা যে রাজসভার কথা তুলিয়াছি, তাহারই আলোচনা করিব। রাজ সভার গভীরতা ও দীর্ঘতা দেখাইবার জন্য পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে মূলপট-খানিতে মধ্যস্থানে সমাপ্তিকেন্দ্র (Vanishing point) স্থির করিয়া যে ভাবে

খিলানগুলি আঁকা হয় তাহাতে গৃহতল ক্রমশ রঙ্গমঞ্চতল ছাড়াইয়া উঁচা হইয়া দৃশ্যপটের মধ্যস্থানে গিয়া শেষ হয়। এইরূপ পটের পার্শ্বে অভিনেতা দাঁড়াইলে মনে হয় রাজসভার গৃহতল তাহার মাথার কাছে, বক্ষের কাছে, বা কটীদেশের নিকট রহিয়াছে, সুতরাং সে যে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা বুঝা যায় না। এইরূপ দৃশ্যে আবার গৃহতলাদি মর্ম্মর প্রস্তরাদি-খচিতবৎ অঙ্কিত হয়; কিন্তু তাহার পটকক্ষের কোণ রেখার (angle line এর) সহিত সে অঙ্কনে মিল থাকে না এবং রঙ্গমঞ্চতলের উপর বিস্তৃত কার্পেট বা রঙ্গীন ক্যাম্বিসের সহিত ও মিলে না সুতরাং বুঝা যায় না যে, দৃশ্যপটের অঙ্কিত গৃহতল কোথাকার আর মঞ্চতলই বা কোথাকার। এই সকল রাজসভায় আবার যখন বিরাট বিপুল সিংহাসন পাতিয়া রাজাসন সাজান হয়, তখন মনে হয়, সেগুলি বুঝি শূন্যে স্থাপিত হইয়াছে, কারণ পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানানুসারে অঙ্কিত গৃহতলের সহিত সে সকল সিংহাসনের পায়াগুলি মিলে না, সিংহাসনের অবস্থিতির সামঞ্জস্য হয় না। সিংহাসনের প্রতি চাহিয়াই যদি মূলপটে অঙ্কিত বিপুল বিরাট খিলানগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ মনে হয় যে, সিংহাসন খানি বুঝি সভাগৃহের দ্বার দেশেই পাতা হইয়াছে কারণ তাহার পশ্চাতে সভার সমস্ত দীর্ঘতাটা দূর-দূরান্তর পর্যন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় মিনার্ভা থিয়েটার সৃষ্টির সময়ে 'ম্যাকবেথ' নাটকে যে, ভোজন গৃহের দৃশ্য (Banquet Hall) আঁকা হইয়াছিল, তাহাতে চিত্রকর উইলার্ড ঘরের একটা কোণ এমন কৌশলে আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং তাহার পার্শ্বপট কয়খানি এমন কৌশলে মূলপটের সহিত মিলাইয়া আঁকিয়াছিলেন যে ভোজনের টেবিল ও চেয়ার গুলির সহিত দৃশ্যটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘগৃহ অঙ্কনে এইরূপ কৃতিত্ব আমরা বঙ্গীয় নাট্যশালায় আর কোথাও দেখি নাই। রাজসভার দৃশ্যের সহচর পরদামণ্ডিত স্তম্ভসারি অঙ্কিত যে পার্শ্বপটগুলির কথা পূর্বে বলিয়াছি, যে স্থলে কক্ষের পার্শ্বপট থাকে না, সেই সেই স্থলে রাজসভার এই পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপটগুলি ব্যবহৃত হয়—তা কে জানে গরীব কেরানীর অন্তঃপুর; আর কে জানে কৃষকের শয়ন-গৃহমধ্য। —এরূপস্থলে দর্শকের মনে কি

উপহাসজনক ভাবের উদ্রেক হয় তাহা আমরা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। পথের দৃশ্যগুলি বঙ্গীয় নাট্যশালায় সর্বপেক্ষা রহস্যজনক। সকল স্থানেই রাজপথগুলি পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে আঁকা। কাহারও সমাপ্তি কেন্দ্র মূলপটের মধ্যস্থানে কাহারও পার্শ্বদেশে কাহারও বা মূলপটের বাহির্ভাগে কোন দূরস্থানে কল্পনা করা হয়। রাজপথের দৃশ্যগুলিতে সৌধমালার সারি, অঙ্কনের নিয়মানুসারে ক্রমশঃ সমাপ্তিক্ষেত্রে গিয়া মিলিত হয় কাজেই পথের পৃষ্ঠ-দেশ রঙ্গমঞ্চের তলদেশ হইতে অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। জানি না এরূপ পথে অভিনেতৃবৃন্দ কিরূপে দাঁড়াইতে পারে বা হাঁটিতে পারে? মঞ্চতলের সহিত কোন পথেরই মিল রাখিতে নাট্যদৃশ্য চিত্রকরকে দেখি অর্থাৎ মরা রঙ ব্যবহার বিধি।

বঙ্গীয় নাট্যশালায় এরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা কেন? দোষ কার? পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নাট্যশালার অধিকারিগণকে আমরা যতটুকু দোষী বলিয়া ধরিতে পারিয়াছি—এক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে ততটুকু দায়ী বলিয়া ধরিতে পারি না। আমরা যতটা জানি, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালায় রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ নামক যে অদ্ভুত জ্ঞানবিশিষ্ট কর্মচারী থাকেন, তিনি এ বিষয়ে একাই দায়ী। তাঁহাকে এ বিষয়ে কেহ বাধা দেয় না. কেহ 'এইরূপ কর' বলিয়া হুকুমে বাধা করে না, বা কেহ suggest করে না। তিনি অভিনেতব্য পুস্তকের দৃশ্যাবলীর তালিকা লইয়াই নিজের মনগড়া উপায়ে যাহা খুসী তাহাই করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে হয়ত গ্রন্থকার কোন একটা বিশেষ দৃশ্যের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ মাত্র করেন, কিন্তু তাহা ঠিক হইবে কিরূপে তাহার কোন উপায় কেহই বলিয়া দেন না।

প্রতি নূতন পুস্তকেই দুই চারিখানি নবীন দৃশ্যপট অঙ্কনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু তাহার দোষগুণ বিচার করিবার কেহ নাই। বেশকারী দাদার কাঁচির ন্যায় মঞ্চাধ্যক্ষ মহাশয়ের তুলিকা যদৃচ্ছাক্রমে যেমন চলে, দৃশ্যপট তেমনি উৎরাইয়া যায়, আর তাহার বিসদৃশতা যতই থাকুক না কেন আমরা দর্শকবৃন্দ তাহাই অপরূপ

দৃশ্য বলিয়া মোহিত চক্ষে দেখি আর জয়গান করি। মঞ্চাধ্যক্ষেরা অনেক সময় ইউরোপীয় ষ্টীল এনগ্রেভিং ও ফটো হইতে দৃশ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন,—কাজেই দুর্গের পরিবর্তে 'কাসল' (castle), বাগানের পরিবর্তে 'ভিলা' (Villa), বারাণ্ডার পরিবর্তে 'করিডোর' (corridor), রাজসভার পরিবর্তে 'ড্রইংরুম' (Drawing room) প্রভৃতির অবাধ অনুকরণ দেখিতে পাই।

কোন কোন পথের দৃশ্যে আবার এতটা বিসদৃশ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি যে পথটি মূলপটের গাত্রে এমন ভাবে আঁকা হইয়াছে যে, পথটির বিস্তৃতির সীমারেখার একপার্শ্বে সৌধমালা ও অপর পার্শ্বে তৃণমণ্ডিত ভূভাগ দেখা যাইতেছে! এরূপ স্থলে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে তাহার অবস্থিতি স্থান যে কোথায় হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পথের দৃশ্যের উপযুক্ত পার্শ্বপট কোন রঙ্গালয়ে আমরা দেখিতে পাই না। সর্বত্র 'বনের' পার্শ্বপট দিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে নাট্যশালার কাজ চলিয়া যায় বটে, কিন্তু দর্শকগণকে বুঝিতে হয় যে, রাজধানীর রাজপথটিতে অঙ্কিত দৃশ্যমান কয়েকটি অট্টালিকার পরেই উভয় দিকেই সুগভীর জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে, অথবা নাট্যশালার চিত্রকরের অপূর্ব যাদুবিদ্যার প্রভাবে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যস্থলে কয়েকটি অট্টালিকা ও এক টুকরা পথ রাতারাতি নির্মিত হইয়াছে। এই বনের দৃশ্যও, যাহা বঙ্গীয় নাট্যশালায় অঙ্কিত হয়, তাহা অতি চমৎকার। ইহার পটগুলিতে ও মূল পার্শ্বপটখানিতে অতি গভীর জঙ্গল আঁকা হয়, কিন্তু রঙ্গমঞ্চতলে একটি তৃণমাত্র থাকে না। বনের মাঝে কোথাও কোথাও সুপরিষ্কৃত স্থান থাকে বটে, কিন্তু সর্বত্র তাহা থাকে না; কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যালয়ের বনমাত্রই সুপরিষ্কৃত ময়দান স্বরূপ। এই বনের উপযুক্ত গভীর বনাংশচিত্রিত পার্শ্বপটগুলি বঙ্গীয় নাট্যশালার অধমতারণ দীনবন্ধু স্বরূপ। এইগুলি দ্বারা কোন্ কার্য যে সাধিত না হয়, তাহা বলিতে পারি না। বনে, উপবনে, মরুভূমিতে, প্রান্তরে, প্রমোদোদ্যানে, পর্বতে, নদীতীরে, রাজপথে, কুটীরে, প্রাঙ্গনে, সমুদ্রে, অন্তরীক্ষে যে কোন দৃশ্য দেখান হক না কেন, এই

দুষ্প্রবেশ্য বনাংশগুলি তাহারই পার্শ্বপটরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন উঠানের চকের বারাণ্ডা বা চণ্ডীমণ্ডপ দেখাইতে হইবে, সেখানেও উহাদের উপস্থিত করা হয়। কোন কুটীরের অভ্যন্তর দেখাইতে হইবে, সেখানেও পার্শ্বপটরূপে এই গুলিকেই উপস্থিত করা হয়।—ইহা অতীব অদ্ভুত, অতীব হাস্যকর, অতীব অন্যায়! নদীতীর বা সমুদ্রগর্ভ দেখাইতে হইলে টানা পাথার আঁকা জল দেখান হয়। সে জলের অন্ত নাই, কিন্তু তাহার তীরভাগ যে কোথায় থাকে, তাহা আমরা কোন নাট্যমঞ্চে দেখিতে পাই না। সমুদ্রের উপকূল থাকে না, নদীর বেলা থাকে না,—সর্বত্রই দেখিতে পাই গ্রাম্য পুষ্করিণীর উপযুক্ত তৃণগুল্ম পরিপূর্ণ তটভূমি। নদী, হ্রদ, তড়াগ, সমুদ্র সকলেরই কিনারা এইরূপ ভূখণ্ড দ্বারা বাঁধা হইয়াছে। মহা তরঙ্গ তুলিয়া সাগর বা নদীর জল ছুটিতেছে। বড়ার জাহাজ ভাসিতেছে, দেবী চৌধুরানীর বজরা ছুটিতেছে, সীতারামের গোলায় নৌকা ডুবিতেছে, অথচ তাহার পার্শ্বপটে সেই গভীর বনাংশ আঁকা রহিয়াছে। মনে হয়, যেন নদী বা সমুদ্রগর্ভে সমান্তরালে ভাবে দুই চারিটা ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যাইতেছে।

তারপর বাগানের দৃশ্য—অধিকাংশ স্থলেই অন্তরীক্ষ দৃষ্টিতে (Bird's eye view এ) সমগ্র বাগানের একখানি ছবি আঁকিয়া দিতে পারিলেই, ভাল উদ্যানের দৃশ্য হয়। তাহাতে বাগানের ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলের বড় বড় চৌকা নানারূপ ছোট বড় রাস্তা, পুষ্করিণী, ফোয়ারা, পাথরের পুত্তলিকা এবং লতাগৃহ ও দূরে ত্রিতল অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্তই আঁকা হয়। এই বাগানে একহাত দেড়হাত উচ্চ ফুলের গাছ ও বিলাতী ঝাউ গাছ ভিন্ন আর কোন বড় গাছ থাকে না; কিন্তু ইহার পার্শ্বপট স্বরূপ সেই গভীর বনাংশচিত্রিত পটগুলিই ব্যবহৃত হয়; চিত্রশিল্পের কি সুন্দর সামঞ্জস্য! আরও এক কথা যে সকল বাগানের দৃশ্যে মূলপটখানিতে বাগানের ফটক আঁকা থাকে; জিজ্ঞাসা করি; অভিনেতৃবৃন্দ সে বাগানের দৃশ্যে বাগানে প্রবেশ করে কিরূপে? রঙ্গমঞ্চতল বাগানের ফটকের সম্মুখে পড়িয়া থাকে, সেখানে দাঁড়াইলে বা বেড়াইলে বাগানে

বেড়ান হয় না। ইহা যে নাট্যশালার চিত্রকর মহাশয় বুঝিতে পারেন না কেন, তাহা কে বলিবে? যাঁহারা মূল দৃশ্যপটের সম্মুখে কিয়দ্দূরে রঙ্গমঞ্চতলে টুকরা দৃশ্য জুড়িয়া বাগানের ফটক সাজাইয়া দেন, তাঁহারা তবু কতটা রীতি বজায় রাখিয়া চলেন; কিন্তু অভিনেতৃবৃন্দ এরূপ স্থলে যখন বাগানের খাতিরে, নাচের খাতিরে সেই ফটকের বাহিরে আসিয়া, ফুটলাইটের কাছে নাচে, গায়, তখন তাহারা মনে ভাবে না যে, দৃশ্যবহির্ভূত এই স্থানটুকু একেবারে বাগানের বাহিরের জমি এবং সেখানে যাওয়া একান্ত অপ্রাসঙ্গিক। বাগানের পূর্ণাবয়ব দেখাইতে গিয়া বাগানের দৃশ্যগুলির অন্তরীক্ষ-দৃষ্ট-বস্তুর অবস্থা অনুসারে আঁকা হয়, কিন্তু তাহাতে মনে হয় যে, অভিনেতৃবৃন্দ কেবল সাজান বাগানের পথ ঘাটের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বন্য শূকরের ন্যায় গাছপালা দলিত করিয়া, যথেচ্ছ ঘুরিয় বেড়াইতেছে! যাঁহারা আবার ঐরূপ বাগানের ছবির সম্মুখে রঙ্গমঞ্চতলে কৃত্রিম লতামণ্ডপ ও ফুল গাছের টব ইত্যাদ সাজাইয়া দেন, তাঁহাদের বুদ্ধি আরও বলিহারি মানিতে হয়। কোথায় বাগানের জমি, আর কোথায় সে সকল সাজান হয় তাহার সামঞ্জস্য কি, তাহা কেহ একবার ভুলিয়াও চাহিয়া দেখেন না, এইরূপ যে কেন দৃশ্যের কথাই তুলি না কেন, তাহাতেই বিসদৃশ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিকন্তু নাট্যমঞ্চ চিত্রনে যে সকল রঙ ব্যবহার করা হয় তাহারও উপযোগিতা বিচার কারবার ক্ষমতা বঙ্গীয় নাট্যশালার চিত্রকরের নাই। দৃশ্য পটগুলি রগ্‌রগে ঝক্‌ঝকে করিবার জন্য অনেকে দৃশ্যপট অঙ্কনে পেউড়ী, সিন্দুর, পান্নার ন্যায় সবুজ আর গাঢ় নীল রঙ ব্যবহার করেন, এই সকল তীব্র রঙের একটি প্রধান দোষ যে, ইহাতে দৃষ্টিরেখা নষ্ট করে। এরূপ তীব্র রঙে অঙ্কিত দৃশ্যপটের সম্মুখে দাঁড়াইলে দর্শকেরা স্থান বিশেষ হইতে অভিনেতার মুখ দেখিতে পান না, তাহা দৃষ্টি রেখার সীমান্ত স্থানে শূন্যে মিশাইয়া যায় অর্থাৎ Vinoac হইয়া পড়ে। এই জন্য চিত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে দৃশ্যপট অঙ্কনে তীব্র রঙ ব্যবহার করা নিষেধ dull colours.

পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় নাট্যশালার অধিকারী দিগকে দৃশ্যপটদি সম্বন্ধেও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে কাতর দেখা যায় না; কিন্তু নাট্যমঞ্চাধ্যক্ষগণ ভারতীয় অট্টালিকাদি দুর্গ, প্রাসাদাদি এবং উপবন পর্বতাদি বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, যাহা মনে আসে তাহাই আঁকিয়া অধিকারদিগের অজস্র অর্থের অপব্যয় মাত্র করেন। এবিষয়ে তাঁহাদিগকে শাসন করিবার কি কেহই নাই? আমরা সর্বপেক্ষা এই বিষয়েই বেশী বিরক্ত। মনে হয়; অজস্র অথ ব্যয় করিয়াও নাট্যশালার অধিকারীবর্গও এক্ষেত্রে কি ভয়ানক প্রতারিত হইয়া থাকেন।

আরও আশ্চর্য বোধ হয় এই যে, যে স্থলে এত বিশৃঙ্খলা, এত মূর্খতা, এত প্রতারণা, সে স্থানে ম্যানেজার ও বিজ্‌নেস ম্যানেজার নামে দু-দুটি কার্য পরিদর্শক থাকিয়া নাট্যশালায় অধিকারীর অর্থের অপব্যবহার ব্যতীত আর কি উপকার করিয়া থাকেন? শুনিয়াছি মিনার্ভা থিয়েটারে ও স্টার থিয়েটারের দুইজন শিক্ষিত চিত্রকর এবিষয় পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি কেবল পটুয়াগনের কাজ বিলি করা, কাজ বুঝিয়া লওয়া আর হাজিরা লেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ নাই? তাহারা চিত্রবিদ্যা শিখিয়া ও বুঝিয়া যদি নাট্যমঞ্চে এই সকল পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে পথ, ঘাট, কক্ষ, রাজসভা আকাইয়া থাকেন এবং অন্তরীক্ষ দৃষ্টিতে দৃষ্ট বাগানের ছবি আঁকিয়া উদ্যানের কাজ চালাইয়া লয়েন, তবে তাহাদের মত শিক্ষিত ব্যক্তির নাট্যমঞ্চে থাকিবার আবশ্যকতা কি?

এবিষয়ে আমরা আর অধিক কথা বলিব না। এক প্রকার মোটামুটি সকল কথাই বলিয়াছি। বিজ্ঞ দর্শকেরা এবং বিজ্ঞ সমালোচকেরা এখন হইতে নাট্যশালায় এই সকল দুর্ব্যবহারের প্রতি দৃঢ়ভাবে আপনাদের বিরক্তি জানাইবার চেষ্টা না করিলে, এ সকল বিষয়ে নাট্যশালায় কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পড়িবে না।

নাচ-গান

(৫)

আমাদের নাট্যশালাগুলিতে নাচ-গানের বড় বাহুল্য হইয়াছে। প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়েই বাহুল্য হয় না, তাহা আমরা বুঝি,—"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে"—কিন্তু "সর্বমত্যন্তগর্হিতম্" কথাটাও শাস্ত্র ও নীতিসঙ্গত,—সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখাটাও যে প্রয়োজন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বহুদিন পূর্বে একজন রসজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছিলেন, "গেরস্থদের মেজো বউ পুকুরঘাটে আলবৎ গাইবে।—শুধু গাইবে?—নাচবে।—তা না হলে সে 'ক্ল্যাপ' পাবে কেন?" এরূপ যুক্তিও যুক্তি বটে, কেননা অন্ধের যষ্টি পুত্রটি যখন ভগবান কাড়িয়া নেন, তখনও লোকে অন্ধকে প্রবোধ দেয়—'ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য'। অবনতিই ভবিষ্যতের উন্নতির কারণ বলিয়া অবনতির হেতুগুলিকে মঙ্গলকর বলিতে পারা যায়, কিন্তু বর্তমান ধরিয়া বিবেচনা করিলে সেগুলি যে অবনতিরই হেতু তাহাতো আর অস্বীকার করা যায় না। মন্দ হইতে ভাল হয় বলিয়াই মন্দকে প্রার্থনীয় এবং পালনীয় করিতে হইবে, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা রাবণাদির ন্যায় শত্রুভাবে বিপরীত পন্থার সাধক হইতে পারেন, কিন্তু সৎপন্থীদিগের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন না বা তাঁহাদের পথও সুপথ বলিয়া বিবেচিত হয় না। —যাক্ এক্ষণে প্রথমে নাচের কথাই ধরা যাক্।

নৃত্য সৌন্দর্য-বিকাশক, নৃত্য হৃদয়ের সুপ্রবৃত্তির উত্তেজক, নৃত্য আনন্দদায়ক, নৃত্য ভাব বিশ্লেষণ করে, এ সকল স্বতঃসিদ্ধ কথার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের জন্য আমরা এ প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি না। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবের ভরে, ভক্তির ভরে, আবেগের ভরে নাচিয়া গিয়াছেন, যে নাচে নবদ্বীপ, জগন্নাথ, দক্ষিণেশ্বর, এমন কি ভারত টলমল করিয়াছিল, সে নাচের তুলনা নাই, সে নাচের অনুকরণ করিবে কে? আর একজন গৌরাঙ্গ বা রামকৃষ্ণ ভিন্ন সে নাচ নাচিতে পারিবে না। সে নাচ শিখাইতে হয় না। গৌরাঙ্গের বা রামকৃষ্ণের কোন কান্তাপ্রসাদ বা নৃপেন্দ্র বসু যে ছিল এমন কথা কোন 'কড়চায়' কোন 'চরিতামৃতে',

বা কোন 'কথামৃতে' কেহ কখনও প্রকাশ করেন নাই। সে সকল নাচ ভগবান নিজে আসিয়াই হউক আর ভগবানের অংশাবতারই হউক, নাচিয়া গিয়াছেন। সে নাচের সহিত আমরা নাট্যশালার বঙ্গমহিলার বঙ্গনৃত্যের তুলনা করিব, কোন পাঠক আমাদের এতটা ধৃষ্ট, বলিয়া ভাবিবেন না।

আমরা আজকালকার নাচ—রঙ্গালয়ের নাচের কথাই বলিব। বেশ্যাদ্বারা নৃত্য, গীত ও অভিনয় হয় বলিয়া আমরা কোন দিন আপত্তি করি না, করিবও না। আমরাও জানি, আমাদের দেশে ঐ কার্যে বেশ্যা ভিন্ন উপায় নাই এবং আরও বুঝি নটীর কার্য বেশ্যাদ্বারাই নির্বাহিত হওয়া আমাদের সমাজে এখনকার পক্ষে কল্যাণকর। আমাদের দেশে কুলাঙ্গনার মধ্যে ঐ কার্যের প্রসার না হওয়াই প্রার্থনীয়।

আজকাল আমাদের নাট্যশালাগুলিতে যে সকল নৃত্য প্রদর্শিত হয়, তাহার অধিকাংশই নৃত্য নামের উপযুক্ত নহে। নৃত্যের ভঙ্গীতে যদি সৌন্দর্যই না প্রকাশিত হয়, তালে তালে যদি আনন্দ-সাগরে ঢেউ না উঠে, তবে নৃত্যের উদ্দেশ্য সফল হয় না। এখনকার নাট্যশালায় নাচগুলি শুনিতে পাই, 'পারসী থিয়েটারের' নাচ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ নাচে আমরা উর্দ্ধাধঃ ভাবে উল্লম্ফন ও তির্যক্‌গতিতে দ্রুত ভ্রমণ ব্যতীত আর কোনরূপ সৌন্দর্য-বিকাশিনী গতি বা অঙ্গচালনা দেখিতে পাই না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'আলিবাবা', 'শিঁরী-ফরহাদ্‌', 'প্রেম-প্রতিমা', 'দলিতা-ফণিনী', 'সাবিত্রী', 'বেদৌরা', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'রাণা প্রতাপ', 'রিজিয়া' ও 'আবুহোসেন' প্রভৃতির নাচগুলি উল্লেখ করিতে পারি। 'আবুহোসেন' ও 'আলিবাবা' এই দুইখানিতে যে সকল নৃত্যভঙ্গী উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, উহাদের পরবর্তীকালে কি নাটক, কি গীতিনাট্য, কি প্রহসন, কি পঞ্চরং যে কোন শ্রেণীর পুস্তক অভিনীত হইয়াছে, তাহাতেই ঐ সকল নাচের অনুকরণে, উহারই হেরফের করিয়া নাচ দেওয়া হইয়াছে, কাজেই ঈষৎ ইতর-বিশেষ-সম্পন্ন একবিধ নাচই আমরা দেখিতে পাই। বিভিন্ন নাট্যশালায় বিভিন্ন শিক্ষকের দ্বারা উদ্ভাবিত হইলেও আজকাল বিশেষ

পার্থক্য কোথাও কিছু দেখা যায় না। 'রাণুর নাচ', 'নেপার নাচ', 'কাশীর নাচ' ইত্যাদি বিভিন্ন নামকরণ হইলেও সকল নাচগুলির ধরণ একই প্রকার, স্থানে স্থানে একটু মাত্র ইতর-বিশেষ থাকে। আমরা ইহার কারণ যতটা অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে অনুকরণপ্রিয়তাই প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিয়াছি। আমরা যতদূর জানি, নাচগানের সমালোচনা দর্শকেরা বা সংবাদপত্রের সমালোচকেরা "আন্জে মৌজে" রকমে করেন, কাহাকেও বিশেষভাবে কোন নাচের বা গানের সমালোচনা করিতে আমরা দেখি নাই; সুতরাং এক নাট্যশালার নাচের অনুকরণ অন্য নাট্যশালায় করিবার প্রয়োজনের মূলে, বাহিরের কোন আগ্রহ বর্তমান নাই; আছে কেবল ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা। 'উহারা এমন করিয়াছে, আমরাও করি' —এই মাত্র; কাজেই আজকালকার এ থেয়ে নাচের অধিকাংশই বিরক্তিকর। এখন যদি কেহ বলেন, আমাদের নাচ দেখিবার চক্ষু নাই, সৌন্দর্য বুঝিবার শক্তি নাই, তাহার সহিত আর কথা চলিবে না। এ সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতে বসিয়া যদি নাচিয়া গাহিয়া, সুসঙ্গত অভিনয় করিয়া প্রমাণ দিতে হয় যে, আমরা এ সকল বুঝি; তাহা হইলে নাচার। ঐরূপ অসঙ্গত আপত্তিকারিদের একটা কথা বলিতে পারা যায়। তাঁহারা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে, সৌন্দর্য বনের পশুপক্ষীকেও আকৃষ্ট করে, সৌন্দর্যে স্তন্যপায়ী শিশুও মোহিত হয়, সৌন্দর্যে জড়ও (idiot) চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, সৌন্দর্যের প্রভাবে উন্মাদ আরোগ্যলাভ করে। আমরা যদিও নৃত্যবুদ্ধিহীন হই আর কোন নৃত্যে যদি সৌন্দর্য যথার্থই বিকশিত হয়, তাহা হইলে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদিগকেও সে নৃত্য দেখিয়া মোহিত হইতে হইবে। যে নৃত্যে তাহা হয় না, সে নৃত্য সৌন্দর্যের বিকাশ করিতে পারে নাই, ইহা বলা অন্যায় নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের নাচে বিলাসলালসাবর্জিত শুষ্ক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে যখন উপনিষৎপাঠ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিয়াছিল, তখন নাচে গানে কে না মোহিত হইবেন? তবে নাচ নাচের মত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে, সাপুড়িয়ার হাতে বানরের নাচের ন্যায় কেবল ভঙ্গীসহ উল্লম্ফনের অনুকারী নাচ হইলে আমরা কেন, কেহই তাহাতে ভুলে না।

আমাদের বর্তমান থিয়েটারে এখন পারসীই হউক আর আরবীই হউক, কে নৃত্য ভাঙ্গিয়াই নৃত্যের অবতারণা করা হউক, তাহাতে সৌন্দর্য বিকাশের দিকে লক্ষ্য থাকিতেছে না। সৌন্দর্যের বিকাশ যে কেবল যেমন-তেমন কৌশলময় অঙ্গচালনেই হয়, তাহা নহে। অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভাব-বিশুদ্ধি আবশ্যক। স্থান, কাল ও গানের ভাবানুনৃত্যপ্রয়োগের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে স্বর্গের অপ্সরী আসিয়া নাচিলেও সৌন্দর্য ফুটাইতে পারে না। "গ্রাম্য-বিভ্রাটে" কলসীকক্ষে কুলবধূগণের নৃত্য, "আলিবাবায়" ফতেমার প্রথম নৃত্য, "আবুহোসেনে" আবুর নৃত্য, "তাজ্জব ব্যাপারে" গোয়ালার নৃত্য, পাতখোলা-ওয়ালার নৃত্য, "রাজাবাহাদুরে"র ধোপানীর নৃত্য, "রিজিয়ায়" দিল্লীর পথে নাগরিকদের নৃত্য, "সিরাজউদ্দৌলায়" ও "মীরকাসিমে" রাজপথে নাগরিকদের নৃত্য প্রভৃতি নাচগুলি আমাদের মতে অপ্রাসঙ্গিক স্থলে অনুপযুক্ত কালে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন নাচ কোন কোন দর্শকের দৃষ্টিতে মনোহর হইলেও যাহাকে সৌন্দর্য-বিকাশ বলে, তাহা করিতে পারে না। বিষয়ের ভাবের সহিত নাচের সঙ্গতি না থাকায় ঐ নাচগুলি আমাদের বড় খাপছাড়া লাগে।

এ বিষয়ে রঙ্গমহিলাদের কোন দোষ আমরা দিই না। নৃত্য-কৌশল শিখাইতে গিয়া নৃত্য-শিক্ষক যে কতকগুলি নিরর্থক অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দেন, গলদ তাহাতেই থাকিয়া যায়। নৃত্যে অঙ্গ সৌষ্ঠব বিকাশের দোহাই দিয়া এখনকার নৃত্য শিক্ষকেরা গানের ভাব, স্থান, কাল এবং ধরণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। কাজেই ঈপ্সিত অঙ্গভঙ্গীলীলা শিক্ষা দিতে যে তাহাদের ভুল হয় তাহা নিশ্চয় আর তাহা উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি দ্বারাই আমরা প্রমাণ করিতেছি।

আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্র মতে নৃত্য দুই প্রকার, তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডব নৃত্য পুরুষের এবং লাস্য নৃত্য রমণীর। স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া যে নাচ, তাহাও লাস্যের অন্তর্গত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে পুরুষের নাচ কিছু নাই। সাঁওতাল, কুক, গারো প্রভৃতি বন্য জাতির মধ্যে কিছু কিছু আছে। আমাদের দেশে এখন রমণীর নৃত্য যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহাও বড় বেশী দিনের নহে। পূর্বে নবাবী

আমলে তয়ফাওয়ালীর নাচ ছিল। তাহা মুসলমান বিলাসিতার সঙ্গে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। হিন্দী-ভাষায় রমণী বোধক "বাই" শব্দই তাহার কতকটা প্রমাণস্থল। এই বাইনাচ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালিনী বারনারীরা খেমটা নাচের উদ্ভাবনা করে। খেমটা নাচের উদ্ভাবন কালে দর্শকগণের সাময়িক রুচি অনুসারে বক্ষ ও কটিভঙ্গীই অধিক স্থান পাইয়াছিল। এই জন্য কালে এই নাচ অতি কুরুচির বিকাশক হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং খেমটা নাচ সুরুচিসম্পন্ন ভদ্র সমাজে সে কালেও বিশেষ আদর পায় নাই। ২০।২৫ বৎসর পূর্বে খেমটা নাচ এদেশে বারোইয়ারী তলার মজলিসে বিশেষ আদর পাইত; এখন দিন দিন তাহাও বন্ধ হইয়া, সে স্থলে রমণী-কীর্তনীর অধিকার হইয়াছে। যাহা হউক, খেমটা ও বাই ভিন্ন এদেশে মধ্য যুগে নাচের অন্য আদর্শ ছিল না।

এদেশে নাট্যশালায় নাচের প্রচলনের পূর্বে যাত্রার দলে নাচের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কিশোর বয়স্ক বালককে বাই খেমটার নাচ ভাঙ্গিয়া অনেক প্রকার নাচের প্রণালী শিখান হইত। সে সকল নাচের মধ্যে অনেক বিশুদ্ধ ভঙ্গীর নাচই থাকিত। তদ্ব্যতীত অনেক প্রকার কৌশলময় বাজীকরের নাচও থাকিত। পায়রা—নোটন, থালা ঘুরাইয়া, মাথায় কলসী, ঘটী, অগ্নি ইত্যাদি রাখিয়া নাচের অনেক খেলা দেখান হইত। "গাহিয়ে লোকা, নাচিয়ে ঝড়ু" ইহা ১৯শ শতাব্দীর মধ্যে ভাগের একটি মহা প্রসিদ্ধ প্রবাদ। বাগবাজারের এই নৃত্য বিশারদ ঝড়ুদাস আজিও জীবিত আছে। তাহার পর অনেক খেমটাওয়ালী স্ত্রীলোকেও এই সকল কৌশলময় নৃত্য অভ্যাস করিত। যাত্রার দল হইতে নৃত্য বিধির অনেকটা সংস্কার হয় বাজীকরের কৌশলময় নাচের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাত্রার দলে আরও কয়েকটি বিশেষ ধরণের নাচের উৎপত্তি হইয়াছিল, এগুলি বেদের নাচ, সাপুড়ের নাচ, বেলুয়ার নাচ, ভুলুয়ার নাচ, ভিস্তির নাচ, মালিনীর নাচ, মুনি গোঁসাই-এর নাচ, কৃষ্ণের নাচ, দূতীর নাচ, ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। থিয়েটারের এতদিনের চেষ্টায় এত নাচের মধ্যে কেবল রাখাল বালকগণের নাচের প্রণালী কতকটা ঐরূপ আখ্যা

লাভ করিয়াছে বলা যায়। কিশোর বয়স্ক বালকের ভূমিকায় নাচ দিতে হইলে. এখন প্রায় সকল থিয়েটারেই এক প্রকারের নাচই দেওয়া হইয়া থাকে, যতটা অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ন্যাশানাল থিয়েটারে সীতার বনবাসের লবকুশের নৃত্য, বেঙ্গল থিয়েটারে প্রহ্লাদের নৃত্য ও এমারেল্ড থিয়েটারে নন্দবিদায়ে রাখাল বালকগণের নৃত্য ভাঙ্গিয়া ঐ নাচের একটি বাঁধাবাঁধি রকম রীতি দাড়াইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য নাচগুলিতে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা কোনরূপ তৃপ্তিকর ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াও পারিয়া উঠিতেছেন না, নাচের জন্য দর্শকেরা বড়ই বিরক্ত। নাচে আজকাল কৌশল সহকারে শোভাব্যঞ্জক অঙ্গ চালনা বা তাললয় অনুসারে সুকৌশলে পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া ইংরাজী "ক্লাউন ডান্সিং" এর অনুকরণে কেবল "ধাপুড়-ধাপুড়" নাচের বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা এমন বলিতেছি না যে, সকল নাট্যশালাতেই নর্তকীরা তালভঙ্গ করিয়া থাকে। ইংরাজীতে যাহাকে grace বলে, আমাদের নাট্যশালার নাচ হইতে তাহা একেবারে অন্তর্ধান হইয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে figure করা বলে এখন আমাদের নাট্যশালার নাচে তাহারই প্রাদুর্ভাব বেশী কিন্তু ইংরাজীতে সেই সঙ্গে grace এর দিকে যতটা বেশী দৃষ্টি থাকে, আমাদের থিয়েটারে সে বিষয়ে ঠিক ততটা কম দৃষ্টি দেওয়া হয়। সেই figure করিতে গিয়া আমাদের নৃত্য শিক্ষকেরা নর্তকীদিগকে উহার আকৃতি গঠনের দিকে এত বেশী মনোযোগিনী করিয়া তুলেন যে, ঘুরিতে, ফিরিতে, চলিতে, দৌড়াইতে, তাহারা শোভা সৌন্দর্যের (elegance and grace-এর) প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। তাহাদের পদভরে ষ্টেজ কম্পিত ও শব্দিত হইতে থাকে, রঙ্গস্থল ধুলায় অন্ধকার হইয়া উঠে, এমন কি পূজার দালানে আরতির সময়ের ধুনার ন্যায় ফুটলাইটের আলো ঢাকিয়া ফেলে। অনেক সময় সম্মুখের আসনে ধুলার জন্য বসা দায় হয়। একবার ক্লাসিকে 'আলিবাবার' অভিনয়ে ও একবার বেঙ্গলে 'প্রমোদ-রঞ্জনে'র অভিনয়ে আমাদের ঐরূপ ঘটনার জন্য উঠিয়া পিছাইয়া আসিতে হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন নাচে যে নৃত্য শিক্ষকেরা ইচ্ছা করিয়াই কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিবার ব্যবস্থা রাখেন, তাহার উদাহরণ দিয়া আমরা আর পাপের পসার, লালসার বেগ বাড়াইয়া দিয়া অপরাধী হইব না। যাঁহারা দেখিতে জানেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইবেন কাহাকেও খুঁজিতে হইবে না। একে তো স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অঙ্গ শোভা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহার উপর যদি কোথাও সৌন্দর্য বিকাশের জন্য একটু অসংযত ভাবে অঙ্গভঙ্গীর ব্যবস্থা করা হয়, তবেই তাহা অশ্লীলতা আনিয়া উপস্থিত করে। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে, আলস্যবসে গাত্রভঙ্গ কালে স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের লাবণ্য সলিলে একটা তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। সে অবস্থায় যদি রমণীর প্রতি কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়ে, তবে পুরুষ দর্শককে স্বভাবতঃই একটু বিচলিত করে—ইহার প্রতিকার নাই আর সেই জন্য হিন্দু নীতিশাস্ত্র কেশ বেশাদি সংস্কারের সময় স্বীয় সহধর্মিণীকেও গোপনে দেখিতে নিষেধ করে। নীতিশাস্ত্রে যদি এতটাই সাবধানতার উপদেশ থাকে, তাহা হইলে নৃত্যের সময় অঙ্গ বিক্ষেপনাদি কত সতর্কতার সহিত শেখান যে আবশ্যক, তাহা নাট্য শিক্ষকেরা বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। তাহার পর আমাদের সমাজে অনবগুণ্ঠিত রমণী সৌন্দর্য চক্ষু ভরিয়া দেখিবার অভ্যাস নাই বা রীতিসঙ্গত ও নহে; তাহাও তাহাদের বুঝিয়া রাখা উচিত; সুতরাং সমাজের রীতি, নীতি, অতিক্রম করিয়া নাচে কুৎসিত, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীর ব্যবস্থা করিলে, সমাজ সহিতে পারিবে কেন?

সে কালের নির্মলচিত্ত পিতৃ-পিতামহের কাছে যাহা অশ্লীল ছিল না, আজকাল পুত্র পৌত্রাদির কাছে তাহা অশ্লীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কালের এ প্রভাব কেহই এড়াইতে পারে না। কালের গতি অনুসরণ করিয়া সকলে চলিতে বাধ্য। বিধাতার রাজ্যও শীত-গ্রীষ্ম ভেদে যখন নিয়মের পার্থক্য ঘটে, তখন মনুষ্যের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাও কালের প্রভাবে যে পরিবর্তিত হইবে না ইহা হইতেই পারে না। সে কালে পিতামহ পাঁচালীর আসরে বসিয়া খেউড় শুনিতেন আর একালে পৌত্র নিজগৃহে বসিয়া একক সেই খেউড় গান আবৃত্তি করিতেও

লজ্জিত হইয়া উঠে। এই কালোচিত শিক্ষার গুণ, সঙ্গের গুণ, প্রাচীনতার দোহাই দিয়া এড়াইতে পারা যায় না। ময়ূরপঙ্খীর উপর কুৎসিত বেশা খড়ের বিঁড়া মাথায় রমণীকুলকে বীভৎসভাবে কোমর দোলাইয়া নাচিতে দেখিলে, কাহারই যে কোনরূপ ভাবোদ্রেক হয় না, এমন কথা নহে। সমাজের যে শ্রেণীর লোকে ময়ূরপঙ্খীর আমোদে আনন্দ পায়, উল্লসিত হইয়া উঠে, তাহারা রঙ্গালয়ের ধার ধারে না, তাহাদের জন্য রঙ্গালয়ের শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচার কোন বিজ্ঞ সমালোচক কোন দিন করিবেন না। আধুনিক নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ কিন্তু এই শ্রেণীরই তৃপ্তি বিরক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নাচ-গানের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত থাকেন। আর শিক্ষিত, রসজ্ঞ, ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া, তাহাদের উপেক্ষার পাত্র হইয়া থাকেন। ময়ূরপঙ্খীর আমোদ যে সমাজের যে শ্রেণীর জন্য ব্যবস্থিত হয়, তাহারা নৃত্যগীতের উচ্চভাব বুঝিতে পারে না। সে শিক্ষা সে জ্ঞান তাহারা পায় নাই, তাহারা উহাতে কেবল বিলাসলীলা ও আমোদ মাত্র উপভোগ করে, সমাজে যাহাদের জন্য বাইনাচের ব্যবস্থা, তাহাদের জন্য যে ময়ূরপঙ্খীর ব্যবস্থা নহে ইহা সকলের বুঝা উচিত। যাঁহাদের জন্য বাইনাচ বা খেমটা নাচের ব্যবস্থা করা উচিত, সেই উচ্চ এবং সামান্য শ্রেণীর সামাজিকগণ যদি রঙ্গাঙ্গনাদিগের নাচের মধ্যে কুৎসিত হাব-ভাব দেখিতে পান, তবে তাঁহারা বিরক্ত যে হইবেন না, তৎপক্ষে কোন উপরোধ দেখা যায় না। সেকালে পয়সার জন্য বেলেঘাটা, হাটখোলার ধনশালী অথচ অমার্জিতরুচি অসংস্কৃতবুদ্ধি, কাব্যরসহীন ব্যক্তিগণের মুখ চাহিয়া চলিতে হইত; কিন্তু তখনও—সেই প্রথম গীতিনাট্য 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয়ের সময়ও, তখনকার নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা তখনকার সমাজেও কুৎসিত ও অশ্লীল বলিয়া অনাদৃত খেমটা নাচকেও রঙ্গমঞ্চে পুরাপুরি স্থান দেন নাই, তখন উৎকর্ষ-সাধনের একটা চেষ্টা ছিল। নৃত্যই যাহাদের ব্যবসা, নৃত্যশিক্ষা দেওয়াই যাহাদের নিত্যকার্য ছিল, এমন সকল ওস্তাদের হস্তেই তখন রঙ্গালয়ের নৃত্য শিক্ষার ভার দেওয়া হইত। এখনও সেই মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখা হইয়াছে

—বিশুদ্ধ খেমটা নাচ এখনও কোন নাট্যমঞ্চে লওয়া হয় না বটে, কিন্তু সাজে পোষাকে, ধরনে-ধারনে, ভাবে-ভঙ্গীতে তাহার অপেক্ষাও অশ্লীল ভাবব্যঞ্জক নৃত্যের, কুৎসিত কল্পনার নৃত্যের অবতারণা করা হইয়া থাকে। বেঙ্গল থিয়েটারে একবার আমরা 'মুই হাঁদু' অভিনয় দেখিতে যাই। মনে আছে, একজন অভিনেত্রী উড়েনী সাজিয়া নিতম্বে চন্দ্রহার দোলাইয়া, দর্শকের দিকে পিছন ফিরাইয়া ঘোড়ার লাথি ছোঁড়ার ন্যায় দুই চরণের আস্ফালন করিতে করিতে এক অপূর্ব নৃত্য করিয়াছিল।—এরূপ নৃত্যকেও ভদ্রসমাজে যাহারা 'নৃত্য' বলিয়া পরিচিত করিতে সাহস করে, তাহারা মনুষ্য চর্মাবৃত অপর কোন জীব না হইয়া যায় না। 'নূরজাহান' নাটকের একস্থানে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে বাঁদিরা নাচিতে নাচিতে রঙ্গমঞ্চস্থলে শুইয়া পড়ে!—ইহার নামও নাচ!—নূতন গীতিনাট্য 'তুফানী'তে নাটকের সহিত অসম্পর্কিত অবস্থায় রমণীরা পুরুষবেশে ডাম্বেল হাতে লইয়া নানা ভঙ্গীতে নাচিতে থাকে; বেঙ্গল, ক্লাসিক, মিনার্ভা, অরোরা, ইউনিক প্রভৃতি নাট্যশালায় নানাবিধ গীতিনাট্যে আমরা এমন কতকগুলি নাচ দেখিয়াছি, যাদের কোন অর্থ পাই না,— কোন নাচে প্রত্যেক নর্তকীর হাতে প্রজ্জ্বলিত মশাল, কোন নাচে ময়ূর পাখা, কোন নাচে কাঠের লাল গোলা ও শিশুদের খেলাইবার লাঠি, কোন নাচে কাগজের ফুলের মালার লহর, কোন নাচে জ্বলন্ত বাতি, কোন নাচে রুমাল, কোন নাচে মদের গেলাস ও ডিক্যাণ্টার ইত্যাদি দেওয়া হয়;—তাহারা উহা লইয়া নাচে—লাফায়; বসে দাঁড়ায় শোয়!—আর নাচের এইরূপ 'কায়দা' দেখাইয়া আধুনিক নাচের ওস্তাদজী বড়ই বাহবা, বড়ই বাহার ঘোষণা করিয়া থাকে। ওস্তাদজীর এই সকল নিরর্থক বিসদৃশ নাচের বড়াই করিয়া হ্যাণ্ডবিলে বিজ্ঞাপনে কত কথাই লিখিত হয় আর তার সঙ্গে নিম্নস্বাক্ষরকারী 'ম্যানেজার' বা 'প্রোপাইটারের' নিরেট বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। আজকালকার স্বনামখ্যাত নৃত্য শিক্ষকদিগের শিক্ষিত ও উদ্ভাবিত অধিকাংশ নাচে নর্তকীগণের কটীদেশের ঊর্দ্ধভাগের কোন অঙ্গের লীলাখেলা বড় বেশী থাকে না; কিন্তু পদদ্বয়ের ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে বহুবিধ

অঙ্গ বিক্ষেপ এত বেশী থাকে যে আমরা প্রত্যেক নাচে তেহাই দিবার সময় প্রত্যেক নর্তকীকে অতি কাতরভাবে হাঁপাইতে লক্ষ্য করিয়াছি। অনেকের এ সময়ে এমনই কণ্ঠরোধ হইয়া আসে যে, গাহিতে পারে না; —গণ্ডায় 'ণ্ডা' দিয়া চলিয়া যায়।

নাচে আপত্তি কাহারই নাই। নৃত্য দোষের একথা কেহই বলে না। নাচের প্রভাব অনেক; নাচের প্রভাবে শুষ্ক সন্ন্যাসী যখন ভাবুক ভক্ত হয়, তখন নাচের শক্তির কথা অনির্বচনীয়। এই শক্তি দুই দিকেই সমান কার্য করিতে পারে। গৌরাঙ্গের নাচ দেখিয়া প্রকাশানন্দ ভক্ত হন আর বাইনাচ খেমটা নাচ দেখিয়া লম্পটেরা বেশ্যার চিরদাস হইয়া পড়ে; একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। লম্পটের নৃত্য দর্শনের মধ্যে বিলাসিনীর হাবভাব কটাক্ষ লীলা এবং সুঠাম অঙ্গযষ্টির তরঙ্গায়িত ক্রীড়া কতটা যে কার্য করে তাহা সমাজতত্ত্বদর্শীরা সকলেই বুঝেন; তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক। আমাদের নাট্যাধ্যক্ষেরাও অনেক সময় এই বিষয়ের সুস্তিও প্রমাণ পাইয়াছেন। তাহারা অনেক সময় অনেক লম্পট দর্শকের প্রভাবে অনেকগুলি প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীকে রঙ্গালয় হইতে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন, অথবা অনেক সময়ে তাহাদের অসঙ্গত আবদার সহ্য করিয়া অনেক অসুবিধায় পড়িয়াছেন। এই জন্যই আমরা বলি, যে নৃত্যের একটা প্রভাব, সামান্য উপেক্ষায় যাহা সমাজে এতটা দোষ ছড়াইয়া দিতে পারে; তাহা যাহাতে দোষসম্পর্কশূন্য হয়, তাহা করা নাট্যাধ্যক্ষগণের উচিত। আমাদের নাট্যশালার প্রথম যুগে যে পয়সার প্রলোভন ছিল, এখনও সেই পয়সার প্রলোভন আছে, কিন্তু তখন কি অভিনয় কি নাচ, কি গান, সকল বিষয়েই রুচির প্রতি দৃষ্টি ছিল। তখনও যেমন পয়সা ফেলিলেই সকল শ্রেণীর লোকেই নাটক অভিনয় দর্শন করিতে পারিত, এখনও তেমনি পারে। কিন্তু এখন রুচির প্রতি আর সে দৃষ্টি নাই। যখন নাট্যশালা ব্যবসাদার হইয়া পড়িল, সেই সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বীয় সঙ্গীদের প্রতি শ্লেষ করিতে গিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন,—এখন তাহার তিক্তসত্য বহু নাট্যশালায়

তাহারই অধ্যক্ষতায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—"পয়সা দে হাড়ি শুঁড়ী দেখে বাহার"। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অনুসারেও ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রসিক-অরসিক, অজ্ঞ-অভিজ্ঞ নির্বিশেষে সকলেই নাট্যাভিনয় দর্শনের অধিকারী নহেন, এখনকার সাম্য স্বাধীনতার দিনে, বনদেবতার প্রলোভনে আধুনিক নাট্যশালা নাট্যশাস্ত্রের ঐ সকল হিতকর বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহেন।

নৃত্য-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা বেশী আবশ্যক বলিয়া মনে হইল, আমরা তাহা বলিলাম। যাঁহারা দেখিতে জানেন, যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারাই জানিবেন, আমরা কিছুই অতিরঞ্জন করি নাই বা মিথ্যা বলি নাই, তবে যাঁহাদের জন্য এত কথা বলিতেছি, তাঁহারা ইহাতে কর্ণপাত করিলে, এ আলোচনা সার্থক বোধ করিব।

গান

(৬)

আজকাল নাট্যশালায় যে রীতিতে গান গাওয়া হয়, তাহা বড়ই অপ্রীতিকর। কি সমবেত (chorus) গান, কি একক (solo) গান, কিছুই স্পষ্ট করিয়া গাওয়াইবার দিকে সঙ্গীতাচার্যগণের আদৌ দৃষ্টি থাকে না। একক গানের অপেক্ষা সমবেত গানগুলি আরও অশ্রাব্য হইয়া পড়িয়াছে।

গানের সুরের কথা আমরা প্রথমতঃ বলিতেছি না। গায়িকারা একাই গান করুক আর কয়েকজনে মিলিয়াই করুক, কোথাও কিছুতেই গান বুঝা যায় না। গানের কথাগুলি না জানিলে, গান শুনিয়া কোন দর্শকে যে তাহা বুঝিবে, কোন সঙ্গীতাচার্য সে উপায় রাখেন না। গায়িকার বাণী-শুদ্ধির দিকে আদৌ তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। শিক্ষার্থিনী হারমোনিয়মের নিকট—শিক্ষকের কানের কাছে দাড়াইয়া যেমন ভাবেই গান করুক, শিক্ষকমহাশয় অতি নৈকট্য-নিবন্ধন তাহার উচ্চারিত শব্দগুলি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। প্রতিদিন শিষ্যাদের মুখে সেই একই গানের সহস্রবার আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহারও শব্দের উচ্চারণের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য করিবার ক্ষমতাও লোপ হয়। স্বরগ্রাম ঠিক হইতেছে

কিনা তিনি কেবল সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে থাকেন। এই দোষে আজকাল আমাদের নাট্যশালায় গানের অস্পষ্টতা বড় বেশী হইয়াছে আর সেই জন্য গীতাবলীযুক্ত অভিনয়-সূচিকা (প্রোগ্রাম) পাইতে দর্শকেরা বেশী লালায়িত হন। এতদ্ভিন্ন আরও এক কারণে গান অস্পষ্ট হইয়া উঠে। আজকাল নাট্যশালায় যাত্রার দলের ন্যায় গানের সঙ্গে পঞ্চাশ থানা যন্ত্র বাজাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। যাত্রার দলে তারের যন্ত্রই বেশী থাকে। এজন্য গায়কের স্বর চাপিয়া যন্ত্রস্বর উঠিতে পায় না, কিন্তু নাট্যশালায় ইংরাজী হারমোনিয়ম, ক্লারিওনেট ফ্ল্যাজুলেট প্রভৃতি উচ্চস্বর প্রকাশক যন্ত্র গানের সঙ্গে বাজান হয়। ইহার কোন যন্ত্রের স্বরই মনুষ্যকণ্ঠের নিম্নগামী নহে; সুতরাং গানের আরোহী-অবরোহী অবস্থায় এই সকল যন্ত্রধ্বনি গায়িকার কণ্ঠকে চাপা দিয়া উঠিতে পড়িতে থাকে, আর গানের গমক্ মূর্চ্ছনা একেবারে লোপ করিয়া দেয়। মিনার্ভার বংশীবাদক অমৃতবাবুর ন্যায় সুকৌশলী যন্ত্রীও অনেক সময় একক (solo) গানের সঙ্গেও বাজাইতে গিয়া বাঁশীর ফুঁকে সংযত করিয়া, গায়িকার কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া যাইতে পারেন না। সময়ে সময়ে তাঁহারও বাঁশী হইতে গায়িকার কণ্ঠ চাপিয়া পোঁ করিয়া একটা কঠিন সুর প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই বাঁশীই (ক্লারিওনেট) ইংরাজী যন্ত্রের মধ্যে স্বরের সূক্ষ্মাংশ প্রকাশে সর্বাপেক্ষা উপযোগী; ইহারই সাহচর্যে বাঙ্গালিনী গায়িকার কণ্ঠস্বরের যখন এত দুর্গতি হয়, তখন অন্য যন্ত্রের কথা দূরে থাক।

হারমোনিয়ম, সুন্দর সুরজ্ঞাপক যন্ত্র; কিন্তু মনুষ্য কণ্ঠের সাহচর্য করিবার জন্য সারঙ্গী বা বেহালার ন্যায় উপযোগী নহে। ইহাতে কণ্ঠস্বর বাঁশী-অপেক্ষাও বেশী চাপা পড়ে। ইংরাজী থিয়েটারেও গানের সময় ইহার ব্যবহার বড় কম, বিশেষতঃ একক (solo) গানের সময় ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। তৎপরিবর্তে পিয়ানো বাজে। পিয়ানোতে টং টং করিয়া কাটা কাটা শব্দে গায়ক গায়িকাকে স্বরগ্রাম মাত্র দেখাইয়া দেয়। তাহার কণ্ঠস্বরের হীনতা পূরণ করিবার স্পর্দ্ধায় আসলে কোন ক্ষতি করে না। আমাদের থিয়েটারে পিয়ানোর ব্যবহার

বেশী নাই ; সুতরাং হারমোনিয়মের সাহায্যে গায়িকাগণের কণ্ঠস্বর আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠে। গঙ্গা, ভবতারিনী, হরিসুন্দরী (বিড়াল), কুসুম (বিষাদ) প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের গলা কোন যন্ত্রস্বরে চাপা পড়ে না এমন উচ্চকণ্ঠী গায়িকা হঠাৎ পাওয়া যায় ? কোন কোন গায়িকার মোটা আওয়াজ ঐ সকল যন্ত্রের স্বরে ডুবাইয়া দিতে পারা যায় বটে, কিন্তু যাহাদের গলায় কাজ আছে, অথচ কণ্ঠস্বর ভরাট নহে, যন্ত্রের স্বরে তাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের সেই কাজগুলি না ডুবিয়া যায়, ইহাতো দেখা আবশ্যক ! যে সকল গায়িকার গলায় কাজ নাই বা যাহাদের গলা উঠে না, তাহাদের কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক অভাব পূর্ণ করিবার জন্য যন্ত্রসাহায্য-আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে, যে কৌশলে বাজান আবশ্যক, তাহা আমাদের নাট্যশালায় দেখা যায় না।

যন্ত্রদোষ ত্যাগ করিলে, আরও একদোষে গান অস্পষ্ট হয় বলিতে পারা যায়। তাহা রীতিমত গীতশিক্ষার অভাব। এখন অধিকাংশ গায়িকাকে সা-রি-গা-মা প্রভৃতি স্বরগ্রাম অভ্যাস করান হয় না। ৮।৯ বৎসরের বালিকাকে বড় বড় সখীর দলে গাওয়াইয়া, তাহাদিগকে তোতা পাখীর মত গান গাহিতে অভ্যস্ত করা হয় মাত্র। গানে তাহাদের কোন পটুতা জন্মে না, সুতরাং তাহারা দশজনে গাহিবার সময়ে গানের সুরের সূক্ষ্মাংশগুলি প্রকাশের সময় জড়াইয়া ফেলিয়া হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে আপনাদের কণ্ঠ মিলাইয়া একটা গীতধ্বনিমাত্র তুলে, প্রকৃত গান করে না। আমরা জানি, এমারেল্ড্ থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুবাবু এই দোষ পরিত্যাগের অভিপ্রায়ে প্রত্যহ প্রত্যেক বালিকাকে সা-রি-গা-মা, শিখাইবার ও সাধাইবার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। কোহিনুরের সঙ্গীতাচার্য পূর্ণবাবু সে বিষয় জানেন। সেই প্রথায় শিক্ষিত বসন্তকুমারী এখন ষ্টার থিয়েটারে থাকিয়া আরও কত উন্নতি করিয়াছে। মিনার্ভার সুশীলা সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাষিণী মধুরকণ্ঠী গায়িকা। তাহার ন্যায় বাণী-শুদ্ধি আর কোন গায়িকার নাই বলিলেই হয়।

নাট্যশালায় সমবেত গীতগুলি যাত্রায় ছোকরাদলের গানের ন্যায় দিন দিন অশ্রাব্য ও অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। যাত্রায় দলের ছোকরাদের যেমন তালে তালে

হাত নাড়া ও সুরে সুরে হাঁ করা, গলা কাঁপান ভিন্ন গানের একটি কথাও বুঝিবার উপায় নাই, কেবল শেষের মেলতার স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণটি মাত্র বুঝা যায় আমাদের থিয়েটারে সমবেত গীতগুলির আজকাল সেই দুর্দশা হইয়াছে—তা কি ষ্টার, কি কোহিনুর, আর কি মিনার্ভা,—সর্বত্রই এই দোষের সমান প্রাদুর্ভাব। সঙ্গীতাচার্যেরা এদিকে দৃষ্টি না দিলে আর কিছুতেই চলে না।। এরূপে আর কিছুদিন চলিলে, ইহার পর নাচ গানের ভরসা দিয়াও আর তাঁহারা দর্শক জুটাইতে পারিবেন না। এই দোষ দূর করিতে যদি সঙ্গীতাচার্যেরা চেষ্টা করেন আর তাহারা প্রথমত কোরাস্ কি সোলো যে কোন গানে গায়িকাদের যে পর্দায় গলা ওঠে, সেই পর্দায় গাহিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের গলার স্বরের অপেক্ষা হারমোনিয়ম জোরে না বাজে, এরূপ ব্যবস্থা করেন এবং ডুগী-তবলার ঠেকা যাহাতে মৃদুভাবে হয়, তাহারও ব্যবস্থা করেন, আমাদের মনে হয়, তাহা হইলেই সহজে তাহারা উহাতে সফল হইতে পারিবেন। ইংরাজী accompaniment অর্থে "সঙ্গে সঙ্গে সমান জোরে বাজান" সঙ্গীতাচার্যেরা এইরূপ বুঝিয়া বাগাতেই এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহারা যদি সেরূপ না বুঝিয়া উহা সাহায্যক অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সমান স্বরে তাললয়ের সাহায্য করা মাত্র, এইরূপ বুঝেন তাহা হইলেই বোধ হয়, দোষটা শুধরাইতে পারে। তবে আমরা বাদ্য ও গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নই, ওরূপ কার্য হইতে পারে কি না জানি না। তবে কেবল যুক্তিতে অসম্ভব নয় বলিয়াই উহার প্রস্তাব করা গেল।

বর্তমান কালে সাধারণ রঙ্গালয়ে হিন্দু সঙ্গীতের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে সময়ে সময়ে ও স্থানে স্থানে যে সকল নাটক সৌখীন থিয়েটারে অভিনীত হইত তাহাতে গানের বাহুল্য ছিল না। অভিনয় কৌশল দেখানোই সেই সকল থিয়েটারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য গানের দিকে বড় একটা দৃষ্টি ছিল না। তাছাড়া সেকালে সুগায়ক অথচ সুনিপুণ অভিনেতা একাধারে মিলিত না। সেই কারণেই বোধ হয় যা দুই চারিটা গান থাকিত তাহা প্রায়ই নেপথ্য হইতে গীত হইত। কোন নির্দিষ্ট গায়ক ভিতর হইতেই সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষ

হইয়া গান করিতেন। অভিনয় মণ্ডপ স্বল্প পরিসর হইত বলিয়া শ্রোতার পক্ষে নেপথ্য হইতে গীত সে সকল গান শুনিবার কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিসর যেরূপ তাহাতে নেপথ্য হইতে গান করা বিড়ম্বনা মাত্র ও সুর যতই সুরচিত হউক না কেন নেপথ্য হইতে গীত গানগুলি প্রায়ই ভাসিয়া যায় এবং শ্রোতাকে বিরক্তি প্রকাশ করিবার প্রচুর অবসর দেয়। এই জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে শ্রোতার সম্মুখীন হইয়া গান করিতে হয় আর এইজন্যই সুষ্ঠ গায়ক গায়িকা নিযুক্ত করা রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদিগের প্রয়োজনীয় কার্যের মধ্যে একটি প্রধান কার্য হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত সৌখীন থিয়েটারে যে সকল গান গীত হইত, অধিকাংশ স্থলে তাহার কথাগুলি প্রচলিত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গানের সুরেই রচিত হইত। সঙ্গীতাধ্যক্ষ গান বাছিয়া দিতেন আর গীত রচয়িতা সেই গানের কথা সকলের সহিত যতদূর সম্ভব অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া নতুন গান রচনা করিতেন। সারির টপ্পা "মিঞা জানি আরবে" গান মিলাইয়া "দেখো ভুলনা এ দাসীরে" গানটি রচিত ও তাহারই ন্যায় তাহারই ভাবে সেই খাম্বাজ রাগিণীতে গীত হইত। এই প্রথায় সঙ্গীতাধ্যক্ষের কোনই মৌলিকতা প্রকাশ পাইত না আর গীত রচয়িতারও কষ্টের অবধি থাকিত না, কারণ আদর্শ গানের গণ্ডির বাহিরে যাইবার অধিকার তাঁহার একেবারেই থাকিত না। স্বাধীনতা হারাইয়া গানে ভাবের স্ফূর্তি কতটা রাখা যাইত, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। সেকালে একেবারেই যে মৌলিক সুর অবলম্বনে গান গাওয়া হইত না, একথা অবশ্য বলি না ; তবে সাধারণ নিয়ম ঐরূপ ছিল। আমাদের এখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ের নিয়ম ঠিক বিপরীত। এখানে নাট্যকার আপনার ইচ্ছানুসারে গান রচনা করেন আর স্বর যোজনার ভার পড়ে "অপেরা-মাষ্টারের" উপর। তিনি যাহা করিলেন, তাহা ঠিক হইল কি না, তাহা দেখিবার বুঝিবার লোক কেহ প্রায়ই থাকে না। এই 'মাষ্টার' যেমন শেখান, গায়িকারা তেমনি শেখে। কতদিন হইলে এরূপেও গান শেখা ঠিকমত হইবে, তাহা "ম্যানেজারেরা" খোঁজ

নেন না। সুর তৈয়ারী হইয়া গেলেই তাঁহারা তাড়া দিতে থাকেন। কখন কখন ম্যানেজারের হুকুম হয় ২০ দিনের (কখন কখন বা ৭ দিনের) মধ্যেই নূতন নাটক অভিনয় করিতে হইবে; সুতরাং "অপেরা-মাষ্টারকে" এই অল্প দিনের মধ্যে নূতন সুর রচনা ও তাল যোজনা করিতে এবং ঐ সুরতালে গঠিত গানগুলি গায়ক-গায়িকাদিগকে শিখাইতে হইবে। বর্তমান সময়ে অন্ততঃ দুই ডজন গানের কম একখানি নাটক বাহির করিলে শ্রোতার নাকি মনঃপূত হয় না। তাহার উপর শিক্ষার্থিনীগণের দলে অধিকাংশই বালিকা থাকে। এরূপ অবস্থায় গানের শিক্ষা কতটা বিশুদ্ধ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সকল কারণেই এই সকল গানের সুর মিশ্র-রাগ-রাগিণীতে বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহাতে অনেক স্থলেই সুর নিকৃষ্ট ও অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। গায়িকাদিগের কণ্ঠস্বর ও শিক্ষার ওজন বুঝিয়া সঙ্গীতাচার্যদিগকে পাঁচ-মিশালী সুরে গান বসাইতে হয়, কাজেই নাট্যশালায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের কোন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে সঙ্গীতাচার্যদিগকে বাধ্য হইয়া অনেক নিকৃষ্ট সুরেরও আশ্রয় লইতে হয়, তবে সুকৌশলে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সংযোগ করা হয় বলিয়া এই সকল গানের অনেকগুলিতে সুখশ্রাব্য ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আজকাল সংখ্যায় অধিক গান শুনিবার লালসা জাগাইয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা সঙ্গীতাচার্যদিগের উপরেও অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে মাসে হয়তো দুইখানা অন্ততঃ একখানা পুস্তকের সুর রচনা করিতে ও শিখাইয়া দিতে হয়। খেয়াল, টপ্পা অবলম্বনে রচিত সুর আজকাল নাট্যশালায় আদরহীন; সুতরাং তাঁহাদিগকে নূতন পথ অবলম্বন করিতে হয়,—জ্ঞাতসারে "মিশ্র" সুরের অবতারণা করিতে হয় আর অজ্ঞাতসারে রাগ বা রাগিণীর সপিণ্ডকরণ তো করিয়াই থাকেন। তার উপর "প্যাণ্টোমাইম" নামধেয় পুস্তকের জন্য এমন বর্ণসঙ্কর সুরের সৃষ্টি করিতে হয় যে তাহার নাম-গোত্র-ঠিকানা ধরা কোন সঙ্গীতকুলাচার্যের সাধ্য নাই। এই স্থলে সকলের উপর ইহাও বিবেচ্য যে, আমাদের নাট্যশালার কোন অপেরা-মাষ্টারের অক্ষয় ভাণ্ডার নাই আর তাঁহাদের বিদ্যারও একটা সীমা আছে। এই সকল

কারণে সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চা হইবার আশা বড়ই কম। নাট্যশালার সঙ্গীতের উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করি, তাহা বলিলাম। এক্ষণে নাট্যশালায় সঙ্গীতাচার্যদিগকেও দুটা কথা বলিবার আছে। নাচের ওস্তাদজীর ন্যায় তাঁহারা খুব একটা নূতন কিছু করিয়া বড় বেশী বীভৎস ব্যাপার ঘটাইতে অবসর পান না বটে কিন্তু নাচের ওস্তাদজীর খাতিরে তাঁহাদের গানগুলি যে মাটি হয়, তাঁহাদের শিষ্যেরা যে দিন দিন অকর্মণ্য হইয়া পড়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। ইহা বড় ভাল কথা নহে। অনেক সময়ে নাচের ওস্তাদজীর খাতিরে গানের ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই তাঁহারা নাচের উপযুক্ত সুর তাল গানে যোগ করেন। ইহা অতীব অন্যায়। নাট্যশালায় একমাত্র নাচই মুখ্য বিষয় হইবে, ইহা কোনক্রমেই সমীচীন নহে। গান গান হইবে, নাচ নাচই থাকিবে। একের জন্য অপরের ক্ষতি হইবে, ইহা কোন ক্রমেই অনুমোদন করা যায় না। আমাদের বিশ্বাস সঙ্গীতাচার্যেরা যদি নাচের ওস্তাদের ফরমায়েস মানিতে বাধ্য না হইতেন, তাহা হইলে, আমরা 'জনার' মদন-রতির গানে, 'আবু হোসেনের' আবু ও আবুমাতার দ্বৈতগানে, 'অশোকে'র পুরবাসিনীগণের গানে, 'রিজিয়া', 'সিরাজউদ্দৌলা' ও 'মীর কাসেমের' নাগরিকগণের গানে, এবং নানা নাটকে বিরহ বিধুরা নায়িকার সম্মুখে সখিদের গানে কখনই নাচ দেখিতে পাইতাম না। এই সকল গানে যে নাচ দেওয়া একান্ত অস্বাভাবিক, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমাদের মনে হয়, নাট্যশালার সঙ্গীতাচার্যেরা গানের সুর তাল সংযোগের সময় নাচের ওস্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা অপেক্ষা অভিনয় শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিলে বেশী সুফল ও সৎপরামর্শ পাইতে পারেন। গানের অর্থ, ভাব, স্থান ও কাল বুঝিয়া এবং অভিনয়ের রাত্রির কোন অংশে গীত হইবে, তাহা বুঝিয়া সুর নির্বাচন করা আবশ্যক। ইহা না বলিয়া দিলেও সঙ্গীতাচার্যগণের বুঝা উচিত। অনেক স্থলে তাহাতেও আমরা নিরাশ হই। তাঁহারাও যদি নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের মত বুঝিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালী দর্শকের পনর-আনা-তিন-পাই-অংশ কেবল নাচই দেখিতে যায়, গান

শুনিতে যায় না, তাহা হইলে বড় ভুল করিয়াছেন। সকলেই সঙ্গীত বুঝেন, এমন কথা আমরা বলি না—কেহই বলে না—তবু সুরে যখন বনের পশু, গর্ত্তের সাপ মুগ্ধ হয়, তখন মানুষ কোন ছার। গানের আবৃত্তি স্পষ্ট হইবে, সহযোগী বাজনার সাহায্যে সুরতরঙ্গ গায়কের সাহায্য করিবে এবং সময়োচিত সুরে নাট্যশালায় অননুভূতপূর্ব তৃপ্তি ঢালিয়া দিবে, তবেতো গান!—নতুবা শবানুগমনের ক্রন্দন রোলেরও সুর আছে, আর ভেড়ার গোহালে আগুন লাগিলেও ভেড়ার পাল অপূর্ব সুর তুলিয়া থাকে!—নাট্যশালায় সেরূপ সুরের প্রত্যাশা কেহ রাখে না।

আর এক প্রধান কথা, হারমোনিয়ম্ যন্ত্রের সহযোগে গান করা সাধারণ নাট্যশালার প্রথা। ইহার অপকারিতা বোধ হয়, সকলে উপলব্ধি করেন না। এই যন্ত্রে অবশ্য স্বরগ্রামের দ্বাদশটি স্বর (ইয়োরোপীয় মতে) বিশুদ্ধ রূপে প্রকাশ করিতে পারা যায়, কিন্তু এই যন্ত্র হিন্দু সঙ্গীতের উপযোগী নয়। যাহারা হিন্দু ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরের উচ্চতার ক্রম বৈজ্ঞানিক নিয়মে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, হিন্দু সঙ্গীতের "ধৈবত" স্বর ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের "ধৈবত" একই পদার্থ নহে। হারমোনিয়মের পর্দার সহিত গলা মিল করিয়া গান করিলে, গায়কের 'ধৈবত' ঠিক হিন্দু স্বরগ্রামের 'ধৈবত' হয় না। বেহাগ রাগিণীতে কড়ি—নিষাদের ব্যবহার হয়, কিন্তু হারমোনিয়মে ঐ পর্দা নাই, সুতরাং হারমোনিয়মের নিষাদের সহিত গলা মিলাইয়া গাহিলে ঠিক বেহাগ গাওয়া হইবে না। টোড়ি প্রভৃতি রাগিণীতে অতি কোমল পর্দার প্রয়োজন। কিন্তু এই যন্ত্রে অতি কোমল পর্দা নাই। সুতরাং সাধারণ কোমল পর্দায় গাহিতে হয় বলিয়া ঐ সকল রাগ-রাগিনীর বিশুদ্ধতা থাকে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, না হয় ঐ রাগিণী বাদ দিয়া সুর রচিত হইবে। যদি বেহাগ, টোড়ি, প্রভৃতি রাগিণীর সুর বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে সাধারণের বোধগম্য ও প্রীতিপ্রদ রাগরাগিণীর আর প্রয়োজন কি? স্বীকার করিলাম, উহাদিগকে বাদ দেওয়া হইবে; কিন্তু ধৈবতের গলদ শোধরাইবার উপায় কি? সাধারণ কর্ণে এ সূক্ষ্মতা অনুভূত না হইতে

পারে। প্রাচীন মতে শিক্ষিত কোন হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞকে স্বরগ্রাম সাধনা করিতে বলিলে, এই পার্থক্যটুকু সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং আরও বুঝিবেন যে, এই যন্ত্র হিন্দু সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার পক্ষে কত বড় অন্তরায়। হারমোনিয়ম, ক্লারিওনেট, প্রভৃতি পাশ্চাত্য যন্ত্রের স্বরবিশেষত্ব (Characteristic tone or timbre) পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরই উপযোগী। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান করিলে, গানের শিক্ষার প্ররোচনায় ক্রমে এমনই অভ্যাস হয় যে, হিন্দু সঙ্গীত গাহিলেও কেমন এক প্রকার বিলাতী-বিলাতী আওয়াজ গায়কের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বাহির হয়। ইহাতে হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব ও কোমলতা রক্ষা হয় না। হারমোনিয়ম যন্ত্র এখন সৌখীন ও পেশাদারী যাত্রাতেও ব্যবহৃত হয়, সুতরাং আমাদের মন্তব্য তাহাদের সম্বন্ধেও খাটে। তবে নাট্যালয়গুলি নাকি সাধারণের বেশী আদরের এবং আনন্দভোগের এবং (ভরসা করি) শিক্ষার স্থল, সেই জন্য নাট্যালয়ের উপলক্ষেই আমাদের বক্তব্য বলা হইল। যাঁহারা জাতীয় সঙ্গীতের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে যত্নবান, আশা করি, তাঁহারা এই প্রবন্ধের কথাগুলি অনুশীলন করিবেন। নাট্যালয়াধ্যক্ষেরাও আমাদের কথাগুলা একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইলে আমরা কৃতার্থ হইব। যাহারা 'নাচগানের জন্যই থিয়েটার' বলিয়া সকল সমালোচনার মুখে গোঁজলা গুঁজিয়া দিয়া, তাহা বন্ধ করিতে চাহেন, তাহারা আমাদের এই নাচগানের কথাগুলায় একটু মনোযোগ দিলে, আমাদের এবং দেশের উপকার করা হইবে সন্দেহ নাই।

অভিনেতৃবর্গ

(১)

বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনেতৃবর্গ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু সকল কথা পুস্তকে লিখিয়া বলা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ প্রয়োজনীয় এত বেশী কথা বলিবার আছে যে সেগুলি পুস্তকে লিখিয়া প্রকাশ করিতে গেলে, বর্তমান পুস্তকের ন্যায় তিন চারি খণ্ড পুস্তকেও কুলাইবে না। অপিচ, অনেক

কথাই আমাদের পক্ষে যেন ধৃষ্টতা হইয়া পড়িবে, সেই জন্য আমরা এই অধ্যায়ে অভিনেতৃবর্গ সম্বন্ধে মোটামুটি গোটা কয়েক কথা মাত্র বলিব।

বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেতৃবর্গ বড় অনুকরণ প্রিয়। নবীন অভিনেতারা পূর্ববর্তী অভিনেতার হাব-ভাব, অঙ্গভঙ্গী, স্বর প্রভৃতি অনুকরণ করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। আদর্শের অনুকরণ করা অনেক বিষয়ে ভাল; কিন্তু অভিনয়কলার আদর্শ স্থির করা বিবেচনা সাপেক্ষ। অভিনেতার পক্ষে অভিনেতব্য চরিত্রই আদর্শ; পূর্ব অভিনেতার ব্যক্তিগত হাব-ভাব আদর্শ নহে। এক ব্যক্তি রাম সাজিয়া মহা চীৎকার করিয়া গিয়াছে বলিয়া, পরবর্তী সকল অভিনেতাকে রাম সাজিয়া চীৎকার করিতে হইবে এরূপ আদর্শপ্রিয়তা বা অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নহে। কোন অভিনেতা ছেদভেদহীন, যতিহীন আবৃত্তিতে কোন অংশ অভিনয় করেন, তাঁহার আদর্শে তাঁহার পরবর্তী সকলেই সেইরূপ করিবে, ইহা মনে করাই ভুল। দৃষ্টান্ত স্পষ্ট হইবে বলিয়া, আমরা কয়েক জন অভিনেতার নাম করিয়াই এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। ৺মহেন্দ্রলাল বসু, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির অভিনয়ে নায়কাংশ অভিনয় করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ ঠায়ে কথা বলিতেন। তাঁহার দ্রুত আবৃত্তির মধ্যেও একটা মৃদুতার উপলব্ধি বেশ সুস্পষ্ট হইত। তাঁহার সমকালীন দু-এক জন অভিনেতা এখন তাঁহার অনুকরণে তাঁহার সেইরূপ আবৃত্তিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা মহেন্দ্রবাবুর স্বাভাবিক ছিল, তাহা এখনকার অভিনেতার অনুকরণ মূলক হওয়াতে, অধিকতর কৃত্রিমতা-ব্যঞ্জক হইয়া ভাব-বিকাশের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। মহেন্দ্রবাবু কোন ভাবের তীব্রতা অভিনয় করিতে গেলে, তাঁহার চোখ কুঁকড়াইয়া যাইত। ইহা তাঁহার স্বভাবজাত দোষ ছিল; কিন্তু আমরা এখন এমন অভিনেতাও দেখিতে পাই, যাঁহারা তাঁহার এই চোখ-কোঁকড়ামিটুকুও অনুকরণ করিয়া থাকেন। এখনকার দিনে অনেক অভিনেতাই ষ্টার থিয়েটারের অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের স্বরানুকরণ, ভাবানুকরণ, ভঙ্গীর অনুকরণ এবং আবৃত্তির অনুকরণ করিয়া থাকেন। এই অনুকরণে তাঁহার

দোষগুলি পর্যন্ত অনুকৃত হয়। তাহাতে ফল এই হয় যে, পরবর্তী অভিনেতার নিজের স্বরে, ভাবে ভঙ্গীতে যে ভাব বিকাশের স্ফূর্তি হইতে পারিত, তাহা, নষ্ট হয়, অধিকন্তু অমৃতবাবুর অনুকরণ করাতে একটা বিসদৃশতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। গিরিশবাবুর গ্রন্থাবলীর নায়ক চরিত্রগুলির অভিনয়ে আমরা এইরূপ অনুকরণ প্রিয়তা অনেক অভিনেতার লক্ষ্য করিয়া, অনেক স্থলে বিষম বিরক্তি অনুভব করিয়াছি। এখনকার কালে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (গিরিশবাবুর পুত্র 'দানী' বাবু) ও অমেরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয়ও অনেকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন দেখিয়া, আমাদের বিরক্তি ও ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং অনুকারীদের বিফল চেষ্টা দেখিয়া হাসিও আসে। সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারের প্রবীর, সিরাজ, মীরকাসিম, ও তুলালচাঁদ অভিনয়ে সুরেন্দ্রনাথ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার যে সকল দোষ আছে, সমালোচনার সম্মার্জনীতে সেগুলি পরিষ্কৃত হইবার অবসর কোন দিন ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার অনুকারী অভিনেতারা, তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া দুধের সহিত বিষটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। এরূপ অনুকরণ করা অতিমাত্র ভুল। কেন যে ভুল, তাহাই একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলিব। প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর বিভিন্ন, গতি প্রকৃতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার উপরেই বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রোধ, হিংসা দ্বেষ, করুণা, তৃপ্তি শান্তি প্রভৃতি ভাববিকাশ নির্ভর করে। আমি যে ভাবে হাসি, কাঁদি, তুমি সে ভাবে হাস না কাঁদ না। আমার হাসি যদি তুমি নকল কর, তাহা নকল করা হইবে। কিন্তু তাহাদ্বারা তোমার হাসা হইবে না। আমি যেমন করিয়া কাঁদি, তুমি তেমন করিয়া কাঁদিলে, আমায় উত্তমরূপে ভেঙ্গান হইবে, কিন্তু তোমার কাঁদা হইবে না। অতএব আমি যে ভাবে হাসিয়া কাঁদিয়া অভিনয় করি, তুমি তাহা অনুকরণ করিয়া অভিনয় করিলে প্রকৃত অভিনয় করা হইবে না। আমায় ভেঙ্গান মাত্র হইবে। আমি ক্রোধ প্রকাশ করিতে গেলে, আমার চোখ মুখের ভাবের এবং স্বরের যেরূপ পরিবর্তন হয়, তুমি সেগুলি অনুকরণ করিলে, তোমার ক্রোধ প্রকাশ করা হইবে না। বরং অন্য একটা বিকৃত ভাব প্রকাশিত হইয়া ক্রোধের অভিনয়টুকুকে

মাটী করিয়া ফেলিবে। বর্তমান কালের অভিনেতারা ইহা বুঝেন না। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনেতৃবৃন্দই বেশী অনুকরণ প্রিয়, অভিনেত্রীবৃন্দ ততটা নহে। এজন্য আমরা স্ত্রী চরিত্রগুলির অভিনয়ে সুকুমারী দত্ত, ছোটরাণী, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী প্রভৃতি প্রাচীন অভিনেত্রীগণের অনুকারিণী অভিনেত্রী দেখিতে পাই না। ৺প্রমদা, ৺কিরণ, ৺ভবতারিণী, ৺এলোকেশী, ৺গঙ্গামণি প্রভৃতি মধ্য যুগের অভিনেত্রীগণের অনুকারিণীও দেখিতে পাই না, অথবা বর্তমান অভিনেত্রীগণের মধ্যে তারা, তিনকড়ি, সুশীলা, বা সুরীর অনুকরণ করিতেও কেহ সাহস করে না। এজন্য আমরা অভিনেতা অপেক্ষা অভিনেত্রীগণের মধ্যেই অভিনয় পটুতা অধিক দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয়, বর্তমান যুগে বঙ্গীয় নাট্যশালায় তারাসুন্দরী, ও সুশীলার ন্যায় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী যেমন নাই, তেমনি তাহাদের সমকক্ষ হইয়া অভিনয় করিতে পারে, নবীন অভিনেতাদের মধ্যে এমন অভিনেতাও নাই। স্ত্রীলোকেরা পূর্ববর্ত্তী অভিনেত্রীগণের অনুকরণ না করিয়া শিক্ষকের উপদেশ অনুসারে অভিনয় শিক্ষা করে বলিয়া, এই সুফল ফলে আর পুরুষেরা শিক্ষকের উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া বা তৎপ্রতি আস্থা না রাখিয়া, পূর্ববর্তী কোন না কোন অভিনেতার ভাববিলাসের অনুকরণ করেন বলিয়া সুফল পাওয়া যায় না। প্রশংসালাভের দুর্দমনীয় লোভ হইতে এই অনুকরণ প্রিয়তার যে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। অমুক অমুক সাজিয়া, এমনি রকম করিয়াছিল, অতএব সেই রকম না করিলে দর্শকে বলিবে, অমুকের মত হইল না—এরূপ ভুল ধারণা হইতে অনুকরণ প্রবৃত্তি জন্মে। অমুক এখানটায় এক্‌টো করিয়া clap পাইয়াছিল, যদি তাহা না করা যায় লোকে আমাকে clap দিবে না—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেক অভিনেতা কুৎসিত অনুকরণ দোষে ইচ্ছা করিয়া ঝাঁপ দেন। এরূপ ধারণা যে বিষম ভুল, তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কতকটা ব্যাখ্যাও পূর্বেই আমরা করিয়া দিয়াছি। বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেতৃবৃন্দকে আমরা সর্বাগ্রে এই দোষ ত্যাগ করিতে বলি। অভিনয় করিতে হইলে, গ্রন্থকার

বর্ণিত চরিত্রটিকে উত্তমরূপে অনুভব করিয়া, তাহাই ভাবে ও ভাষায় যথাসাধ্য জীবন্ত করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহার অভিনয়ে অন্য অভিনেতা কি করিয়া গিয়াছে ও কি ভাবে হাত পা নাড়িয়াছে মুখ নাড়িয়াছে, কথা কহিয়াছে তাহা অনুকরণ করা, কোন ক্রমেই উচিত নহে। তরুবালায় 'অখিল' অভিনয় করিতে গিয়া যদি কোন অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের অনুকরণ করেন, তবে, 'অখিল' চরিত্র অভিনয় করা হইবে না। অখিল বেশী 'অমৃতলাল মিত্র' অভিনয় করা হইবে। সিরাজউদ্দৌলা, বা দুলালচাঁদ অভিনয়ে যিনি 'দানী বাবুর' অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি এই দুই চরিত্র অভিনয় করিতে তো পারিবেনই না অধিকন্তু দানীবাবুর ভাববিলাসের (Manarism) অনুকরণ করিয়া সাধারণের সম্মুখে তাহার এক কুৎসিত শ্লেষাত্মক অভিনয় (caricature) করিবেন।* এইরূপ অনুকারীকে অমৃতবাবু বা দানীবাবুও আপনাদের অনুগামী বন্ধু মনে না করিয়া শ্লেষকারী শত্রু বলিয়াই মনে করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্তৃক কাঙ্গালীচরণের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, যে, নৃপেন্দ্রবাবু এই ভূমিকার পূর্ব অভিনেতা ৺শ্যামাচরণ কুণ্ডুর স্বর ও ভাববিলাসের অনুকরণ করিতে গিয়া কিরূপ বিচিকিৎস্য ভাবের আবির্ভাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্যামাচরণবাবু গুলিখোরের উপযুক্ত

* সাধারণ নাট্যশালা ব্যতীত অবৈতনিক নাট্য সমাজগুলিতে আমরা এই অনুকরণ দোষের অতিমাত্র প্রাবল্য দেখিতে পাই। বর্তমান কালে যতগুলি অবৈতনিক নাট্যসমাজ আছে তন্মধ্যে চোরবাগানের বান্ধব নাট্যসমাজের (Friends Dramatic Union-এর) সুনাম আছে। তাঁহাদের মধ্যে 'রাজসিংহ' অভিনয়ে যিনি 'রাজসিংহের' অভিনয় করিয়া থাকেন, সেই অল্পবয়স্ক যুবককে প্রবীণবয়ঃ অমৃতলাল মিত্রের স্বভাব সুলভ অঙ্গবিক্ষেপাদির অনুকরণ করিতে এবং স্বরভঙ্গী রক্ষা করিতে যখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে দেখি, তখন তাঁহাদের প্রতি আমাদের যুগপৎ বিরক্তি ও দয়ার উদয় হয়। এরূপ চেষ্টায় হাস্যরসের উদ্রেক ব্যতীত আর কোন সুভাব উদ্রিক্ত হয় না।

বাজখাঁই ধরা গলার অনুকরণ অতি সুন্দর করিতেন। সেই স্বরের সরুমোটা আবশ্যক স্থলে তিনি এত সুন্দর খেলাইতে পারিতেন যে শুনিলে, স্বরটি যে তাঁহার স্বাভাবিক নহে ধার করা, বিকৃত স্বর, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। নৃপেন্দ্রবাবুর এই বিকৃত স্বরটিতে গলা-সাধা ছিল না, উহার সরুমোটা খেলাইবার কৌশল তিনি জানেন না, শেখেন নাই বলিয়া পারেনও না—কাজেই তিনি এক ঘেয়ে ভোঁদা বাঁজখাই স্বরের একই পর্দায় সর্বদা কথা কহায় তাহা মোটেই সুখশ্রাব্য বা সুখগ্রাহ্য হয় নাই।

আমরা নবীন অভিনেতৃবর্গকে সানুনয়ে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যদি অভিনয়-কলা-কৌশলে পটুতা লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে এই অনুকরণ দোষ সর্বাগ্রে যত্নপূর্বক বর্জন করিতে যত্নবান হউন। এইপ্রসঙ্গে আর একটা ক্ষুদ্র অথচ প্রধান কথা বলিয়া রাখি। নবীনই হউন আর প্রবীণই হউন, যাঁহাদের অভিনয়ে কোন না কোন প্রকার ভাববিলাসের আধিক্য থাকে, লোকে তাঁহাদের সেইটুকু অনুকরণ করিতে প্রলুব্ধ হয়। যাঁহাদের অভিনয়ে সে দোষ থাকে না, সহজ সরল বিশুদ্ধ অভিনয় যাঁহারা সর্বদা করেন, তাঁহাদের অনুকরণে একটা বিশেষত্ব কেহ খুঁজিয়া পায় না। আজ পর্যন্ত কোন অভিনেতাকে অর্দ্ধেন্দুবাবু, গিরিশবাবু বা অমৃতলাল বসুর অভিনয় প্রথা অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইতেও দেখিলাম না। উঁহাদের সহজ সরল অভিনয় প্রথাই অনুকরণের গণ্ডীর বাহিরে।

অভিনেতৃবর্গের আর একটা দোষের কথা উল্লেখ করিব। অধিকাংশ অভিনেতা মনে করেন, আমরা যখন অভিনয় করিতে দাঁড়াইয়াছি, তখন আমাদের স্বরে একটা বিশেষত্ব থাকা চাই, নতুবা লোকে শুনিয়া মুগ্ধ হইবে কেন?—এই ভাবের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা অনেকেই নিজের সরল কণ্ঠস্বর ত্যাগ করিয়া একটা বিকৃত ধার করা স্বরে অভিনয় করিতে থাকেন। ইহাতে ভাববিকাশের বিশেষ অন্তরায় ঘটে, কারণ এই ধার করা স্বরে হাসি, কান্না, ক্রোধ, ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি ভাবের আনুষঙ্গিক আরোহ-অবরোহ কিরূপ হইবে, তাহা অভ্যাস না থাকায় অভিনয় কালে স্বরটি অতি কুৎসিত হইয়া

হইয়া পড়ে। এরূপ স্বরবিকার কোন সূত্রেই অবলম্বনীয় নহে। আজকালকার কোন কোন যুবক সাধারণতঃ অভিনয় কালে নিজের সহজ, সরল স্বর চাপিয়া একটু গম্ভীর স্বর অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বরে যখন বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠের অভিনয় করিতে হয় তখন আর সে ধার করা স্বরের গভীরতার বৃদ্ধিকরা দূরে থাক, সহজটুকু বজায় রাখিতে পারেন না। 'ভ্রমরের' অভিনয়ে অমরেন্দ্রবাবুর অভিনয়াংশে এ বিষয়ের যথেষ্ট ব্যভিচার দেখিয়াছি। ঐরূপ স্বরের উপরে যখন আবার ক্রোধের বা ক্ষোভের অভিনয় করিতে হয়, তখন সুরের উচ্চতায় গভীরতা ঘুচিয়া গিয়া স্বভাবসিদ্ধ বাঁশীর ন্যায় কোমল সুরের উচ্চগ্রাম প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা 'হরিরাজে'র অভিনয়ে অমরেন্দ্রবাবুর বৈলক্ষণ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ ধার করা গলায় করুণার সুর শান্তভাবের সুর যে কেবল ক্রন্দনের সুর হইয়া পড়ে, তাহা আমরা জনার অভিনয়ে দানীবাবুর অভিনয় কালে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব কখন কোন কারণে, কোন অভিনেতা অভিনয় করিতে উঠিয়া, নিজের সহজ স্বর পরিত্যাগ করিয়া কোন বিকৃত স্বরের সাহায্য লইতে চেষ্টা করিবেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবুর বরুণচাঁদের সুর কিংবা শ্যামকুণ্ডুর কাঙ্গালীচরণের সুর অথবা কিশোরীলাল করের কাফ্রি খোজার সুর বিকৃত বটে? কিন্তু সে সকল সুর লইয়া যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বরবিকারের উপর বিশেষ আধিপত্য আছে, তাঁহারা সেই বিকৃত স্বরেই ভাবভেদে স্বরভেদ দেখাইতে পটু। তাঁহাদের মত এ বিষয়ে কৃতকর্মা ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় স্বরভঙ্গী লইয়া ইচ্ছামত খেলাইতে পারেন, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করুন না, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। যাঁহারা তাহা পারেন না, তাঁহাদেরই আমরা বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি যে, অভিনয় করিতে হইবে বলিয়া একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অবলম্বন করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তাহার পর অভিনয় বিদ্যার বর্ণপরিচয় কালে যে সকল নিয়ম শেখা উচিত, আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালায় সে সকল নিয়ম শিখাইবার প্রতি আজকাল কোন

শিক্ষকের দৃষ্টি নাই। এইরূপ কয়েকটি দোষের কথা উল্লেখ করিয়া, আমরা প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেতৃবৃন্দের একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে যে, দর্শকেরাই তাঁহাদের কথোপকথনের পাত্র, আর সেই ধারণায় তাঁহারা যাহা কিছু কথাবার্তা কহেন, তাহা সমস্তই দর্শকগণের দিকে চাহিয়া এবং যেন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহেন ; কিন্তু তাহা একেবারেই করা উচিত নহে। দর্শকের সহিত অভিনেতৃগণের কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন তাহা স্পষ্টরূপে দর্শকের আসনের সর্বশেষ শ্রেণীতেও যেন শুনা যায়। স্বরের এইটুকু উচ্চতা বজায় রাখিয়া অভিনয় করিতে পারিলেই তাঁহাদের দর্শকগণকে শুনানী সম্বন্ধীয় কর্মটুকু অতি সুশৃঙ্খলে করা হইল বলিতে পারা যায়। এই শুনানীটুকু ব্যতীত দর্শক আছে কি নাই, এ খেয়াল রাখাই অভিনেতৃগণের একেবারে কর্তব্য নহে। অভিনেতৃবর্গের তৃপ্তি-বিরক্তির প্রতি জবরদস্ত অভিনেতার লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার ভাব বিকাশের বিষয় অন্তরায় ঘটে, নিজের অভিনেতব্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ চঞ্চল হইয়া পড়ে। হাতমুখ নাড়া, অঙ্গভঙ্গীদ্বারা বক্তব্য বিষয়ের ভাববিকাশের চেষ্টা প্রভৃতি যাহা কিছু করণীয়, তাহা -সহচরঅভিনেতার প্রতি চাহিয়াই করিতে হয়। নতুবা তাহারও অভিনয়ে দোষ আসিয়া পড়ে। সহচর অভিনেতার দিকে চাহিয়া কথাবার্তা না কহিলে যে, কতটা দোষ ঘটে, তাহা ষ্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানিবাবুর) অভিনয় যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারই বুঝিতে পারিবেন। এই দুই প্রসিদ্ধ অভিনেতার অপরিহার্য দোষ এটিই। ইহাদিগকে কখনও সহচর-অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রতি চাহিয়া অভিনয় করিতে কোন দৃশ্যেই দেখা যায় না। যাহারা ইঁহাদের অনুসরণ করেন, তাঁহারাও অবাধে এই দোষটির অনুকরণ করিয়া থাকেন। এরূপ নবীন অভিনেতা অনেকেরই নাম করিতে পারা যায়। অভিনেতারা যখন স্বগত-বাক্যের অভিনয় করিতে থাকেন, তখন সহচর অভিনেতা পার্শ্বে

থাকুক বা না থাকুক, তখনও দর্শক সম্বোধনে কোন অভিনয় করা আরও দোষের হয়। স্বগতবাক্য অভিনয়কালে একা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া যদি দর্শকের প্রতি মুখ ফিরাইয়া হাতমুখ নাড়িয়া বক্তব্য বিষয় অভিনয় করা হয় তাহা হইলে মনে হয় যেন, বক্তৃতামঞ্চ হইতে কোন সুবক্তা বক্তৃতামাত্র করিতেছেন, কোন অভিনেতা যে অভিনয় করিতেছেন, এভাব কিছুতেই আসে না। আমাদের বিবেচনায় স্বগতবাক্যের অভিনয়ে দর্শকের দিকে দৃষ্টিপাত করা একেবারে উচিত নহে। স্বগত-বাক্য অভিনয় করা অল্প ক্ষমতার কাজ নহে, ইহারই অভিনয়ে অভিনেতার নিপুণতা বেশী আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীকে বিশেষরূপে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি এবং প্রত্যেক শিক্ষককে অতি সতর্ক হইয়া শিক্ষা দিতে অনুরোধ করিতেছি।

অভিনেতৃবৃন্দের আর এক প্রকারের একটি দোষ আমরা সর্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, অভিনেতৃবৃন্দ, অধিকাংশস্থলে কথোপকথনের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের ভাবোচিত হাত-মুখ নাড়া, অঙ্গভঙ্গী করা, স্বরভঙ্গীদ্বারা অর্থাবকাশের চেষ্টা প্রভৃতি বিলাসলীলাগুলি প্রদর্শন করেন না, কেবল তোতা-পাখীর মুখস্থ বুলির মত কথাগুলি আবৃত্তি মাত্র করিয়া যান। ইহাতে অনেককেই 'আড়ষ্ট-ভৈরব' বলিয়া মনে হয়। কাঠের পুতুল কেবল মাত্র কথা কহিলে, যেমন ভাব বুঝা যায় না, এ ভাবের অভিনয়েও ঠিক সেইরূপ ভাবের অভাব ঘটে। অভিনেতৃবৃন্দ পুতুল-নাচ অবশ্য দেখিয়াছেন, পুতুলেরা কথা কহেন না, কিন্তু নাচওয়ালার কৌশলে তাহারা কাঠের হাত, কাঠের মুখ নাড়িয়া সম্পূর্ণ ভাবাভিনয় দেখাইতে এবং দর্শককে তৃপ্তি দিতে সক্ষম হইয়া থাকে। পুতুলের পক্ষে যদি অভিনয়ের জন্য এগুলো আবশ্যক হয় মানুষের পক্ষে অভিনয়ে এগুলা কেন যে আবশ্যক হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা বন্ধুতে-বন্ধুতে পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে বা শত্রু-মিত্রে যখন কথাবার্তা কহি, তখন আমরা উভয়ে উভয়কে, উভয়ের বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত আবশ্যকমত কত প্রকারে মস্তক-সঞ্চালন, হস্ত-সঞ্চালন, দৃষ্টিভঙ্গী, স্বরভঙ্গী

করিয়া থাকি ; একজন কথা কহিবার সময়ে অপরে তাহার কথা যে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, ইহা বক্তাকে বুঝাইবার জন্য নির্বাকে শিরঃকম্পন, গ্রীবাভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ করে। অভিনেতৃদ্বয়ের মধ্যে অভিনয়কালে যদি এইগুলি ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে, সে অভিনয় কখনই দর্শকের বোধগম্য ও তৃপ্তিপ্রদ হয় না। যাঁহারা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'রমেশ' এবং 'মিষ্টার সিং'-এর অংশ অভিনয় দেখিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফীর 'বিক্রমাদিত্য' ও 'নব খুড়ো'র অংশ অভিনয় দেখিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের (বলিদানে) 'করুণাময়' ও (মায়াবসানে) কালীকিঙ্করের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এই-গুলির আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন। আমরা জানি, বক্তব্য বিষয়ের ভাব বিকাশের অনুকূল বিলাসলীলা প্রদর্শনে অনেকে লজ্জিত হন। এ লজ্জা গণিকার লজ্জাবৎ অভিনেতার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এইজন্য আমাদের অনুরোধ এই, উপযুক্ত বিলাসলীলা বা হাব-ভাব প্রদর্শন করিতে কোন অভিনেতার বা অভিনেত্রীর পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। ইহা অতি মনোযোগ সহকারে শিক্ষা করিতে হয়, ইহা শিক্ষা করিতে বিলম্বও ঘটে, হাত, মুখ, মাথার জড়তা ভাঙ্গিতে অনেকের বেশী বিলম্ব হয় ; চক্ষু লজ্জাই তাঁহাদের প্রধান বাধা।

আমরা যে কয়টি দোষের কথা উল্লেখ করিলাম, অভিনেতৃবর্গ এই সকল প্রধান দোষ বিশেষ যত্ন সহকারে পরিত্যাগের চেষ্টা করিলে, পরম আপ্যায়িত হইব। শিক্ষকগণ, অধ্যক্ষগণ ও অধিকারীগণ যদি তাঁহাদের অধীন অভিনেতৃ-বৃন্দের উন্নতি কামনা করেন, সাফল্য কামনা করেন, সুখ্যাতি কামনা করেন, তবে এই সকল দোষ তাহাদের মধ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। স্বগত-বাক্য অভিনয়েও যেমন কৌশল আবশ্যক—শিক্ষা দানেও তেমনি কৌশল আবশ্যক। ফলকথা, স্থান-কাল-পাত্র-ভাব বুঝিয়া শিক্ষক মহাশয়েরা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। হাবা-বোবা লোকে কথা কহিতে পারে না,—অভিনয় করিয়াই তাহারা মনোভাব প্রকাশ করে। তাহাদের সে অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গীই একমাত্র সহায়, অতএব যাহাদের ভাষা আছে,

যাহারা কথা কহিতে পারে ;—তাহারা ভাষার সাহায্যে গ্রন্থকারের রচনা শুনাইবারও অধিকারী কিন্তু অভিনয় করিতে হইলে, তাহাদিগকে অঙ্গভঙ্গীর সম্পূর্ণ সুসঙ্গত বিকাশ দেখাইতেই হইবে। নাট্যশালায় শিক্ষকবৃন্দ ও অভিনেতৃবৃন্দ এই সারভূত কথা কয়টির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিলে আমরা চিরবাধিত হইব।

অভিনয়ের সময় *

(৮)

এবার আমাদের আলোচনার বিষয় নাট্যাভিনয়ের সময়ের পরিমাণ।—ইহা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎপ্রতি কোন নাট্যশালার অধ্যক্ষের দৃষ্টি নাই। তাহারা "চলে আয় খদ্দের আট আনায় নাটকের গাদা"—বলিয়া নূতন বাজারের তরকারীর ফড়ের ন্যায় হাঁক দিতে এতই পরিপক্ক হইয়াছেন যে, তাহাতে দর্শকের স্বাস্থ্য, আরাম, তৃপ্তি সমস্তই নষ্ট হইতেছে। এজন্য আমরা বড় গোলে পড়িয়াছি। যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে আমরা নাটকাভিনয় দেখিয়া আসিতেছি ; এখন বয়স হইয়াছে ; তথাপি অভ্যাস বশতঃ এখনও নাট্যামোদ ভিন্ন আর কোন আমোদ ভাল লাগে না, তাই এখনও নাটক দেখিতে আসি ; কিন্তু এখনকার নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা অভিনয়ের সময় সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন তদনুসারে অভিনয় দেখিতে গেলে, আমাদিগকে বাঁচিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আসিতে হয় ; বিশেষতঃ বর্তমানে যেরূপ দুঃসময় পড়িয়াছে এ সময় রাত্রিজাগরণই নিষিদ্ধ, তায় সন্ধ্যা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ঠায় বসিয়া জাগা।—অসহ্য !

সহরে এখন চারিটি বাঙ্গালা রঙ্গভূমি চলিতেছে। চারিটি রঙ্গভূমিই আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় পড়িয়া কেবল দর্শকের সর্বনাশই

* এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর মিউনিসিপ্যাল আইনের বশে বাধ্য হইয়া এখন কোন নাট্যশালায় রাত্রি একটার অধিক অভিনয় করা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ পর্বাহে "চারিপ্রহরব্যাপী অভিনয়" করিবার বা দেখিবার লোভ এখনও নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ ও দর্শকগণ ছাড়িতে পারেন নাই।

করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। দর্শকগণের রুচির কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা, স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ইত্যাদির দিকে যদি নাট্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এমনই করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকেন, তাহা হইলে কালে রঙ্গভূমিগুলির দুর্দশার একশেষ হইবে। অভিনয় ভাল হওয়া দূরে থাক, দর্শক জুটান ভার হইবে।

প্রথম ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনয় যখন নূতন-বাজারের সান্যালদের বাড়ীতে হইত, শুনিয়াছি, তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র—প্রতি শনিবার অভিনয় হইত। তাহার পর যখন বেঙ্গল থিয়েটার খোলা হইল, তখন প্রথম প্রথম তাঁহারাও সপ্তাহে একদিন—প্রতি শনিবারেই অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। শেষ ন্যাশন্যাল থিয়েটার যখন গ্রেট ন্যাশন্যাল নাম লইয়া বীডন স্ট্রীটে নিজের নাট্যশালায় আসিয়া বসিল, তখন পার্শ্বে বেঙ্গল থিয়েটার চলিতেছে, কাজেই প্রতিযোগিতায় পড়িতে হইল, কিন্তু তখনও সপ্তাহে অভিনয়ের দিন বাড়িল না, কেবল শনিবারেই অভিনয় চলিতে লাগিল। তখন আরও নিয়ম ছিল, একরাত্রিতে কখন কোথাও দুইখানি পুস্তকের অভিনয় হইত না। কি নাটক, কি প্রহসন, কি নাট্যগীত—যাহাই অভিনয় হইত, তাহার একটাই হইত। প্রথম প্রথম যখন প্রহসন অভিনয় আরম্ভ হয়, তখন প্রতি রাত্রিতেই যে উহার অভিনয় আবশ্যক হইত, এরূপ কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। পুস্তকের অভাব যে ছিল না, তাহাও নহে। এদেশে নাট্যশালার সৃষ্টিই প্রহসনের অভিনয়ে, তখন দীনবন্ধু, মাইকেলের অনেকগুলি প্রহসন ছিল। একে একে সেগুলি সবই অভিনীত হইয়াছিল। প্রথম প্রহসনের প্রচলন হইবার পূর্বে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে নির্বাক অভিনয়ে প্যান্টোমাইম এবং সাময়িক ঘটনাবলি লইয়া উপস্থিত মত একষ্ট্রাভেগাঞ্জা অভিনীত হইত।

শেষে যখন গীতিনাট্য অভিনয়ের সূত্রপাত হইল, সেই সময়ের কিছু পরে প্রতিযোগিতায় পড়িয়া দর্শক আকর্ষণের জন্য গীতিনাট্য অভিনয়ের সঙ্গে প্রহসনের অভিনয় করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশন্যাল ও বেঙ্গলের মধ্যে কে সর্বপ্রথমে এই প্রথা চালান, তাহা ঠিক শুনি নাই।

এইরূপে অভিনয়ের সময়ের পরিমাণ একটু বাড়িয়া গেল। দর্শকের তখন নূতন আমোদের নূতন ক্ষুধা বড়ই অধিক। তখন তাঁহারা যেখানে একটু বেশী দেখিতে পাইতেন সেখানেই যাইতেন, বেশী রাত্রির আপত্তিটুকু গ্রাহ্য করিতেন না। তখন কিছুকাল গীতিনাট্য ব্যতীত বড় নাটকের সহিত প্রহসন অভিনয় করাটা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা যেন হীনত্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কোন থিয়েটারে কিছুতেই নাটকের সহিত প্রহসন অভিনয় করিতেন না। শেষে যখন ষ্টার থিয়েটার জন্মিল, সেই সময়েই বা তাহার কিছু পূর্বেই যেন বোধ হয়, ঐ প্রতিযোগিতায় পড়িয়াই বড় নাটকের সঙ্গেও প্রহসন অভিনয় করা আরম্ভ হইল।

সেই অবধি প্রতি রাত্রিতে দুইখানি পুস্তকের কম অভিনয় করিলেই যেন হীনত্ব ঘটিত, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের মস্তিষ্কে এই ভাব নূতন ঢুকিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন নাটক প্রথম খুলিবার পর তাহা কয়েক সপ্তাহ নিঃসঙ্গভাবে অভিনয় করার রীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আজ-কালও তাহা কতকটা আছে, তবে সর্বত্র নাই।

নাট্যশালার প্রথম অবস্থায় যখন একখানি পুস্তকের অভিনয় হইত, তখন শীতকালে ৮।৷০ টার সময় আরম্ভ হইত, শেষ হইতে বড় জোর ১২৷৷০ হইত, গ্রীষ্মকালে একটার অধিক লাগিত না, তাহার পর যখন হইতে দুইখানি পুস্তকের অভিনয়ের সূত্রপাত হইল, তখনও পুস্তক নির্বাচনগুণে ঐরূপ রাত্রিই হইত, কিন্তু শেষে কর্তৃপক্ষেরা শনিবারে সর্বকালে ৯টায় অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তখন হইতে দুইটা না বাজিলে আর বাড়ী ফিরিতে পারা যাইত না। ইহাতেই লোক ধরিত না; কিন্তু তাহার পর আবার বুধবারেও অভিনয় করার ব্যবস্থা হইল। তখন হইতে দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বার ভেদে তাহা ভাগ হইয়া পড়িতে লাগিল। পূর্বে যখন রবিবারে অভিনয় আরম্ভ হয়, তখন উহা অর্দ্ধ অভিনয়ের দিন বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়। যাঁহারা একটা দুইটা পর্যন্ত রাত্রি জাগিতে ইচ্ছুক নহেন বা পুত্র-পৌত্রাদিকে রাত্রি জাগিতে দিতে চাহেন না, তাহাদের জন্যই

রবিবারে সান্ধ্য অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে সেকালে থিয়েটারের একটু লাভও হইয়াছিল, বয়স্ক লোকেরাই অধিকাংশ রবিবারে অভিনয় দেখিতে আসিতেন আর ১০/১১ টার মধ্যেই দেখিয়া শুনিয়া বাড়ী ফিরিতেন। শেষে যখন এমারেল্ড্ থিয়েটার স্থাপিত হইল, সেই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার আরও দোকানদারি আরম্ভ করিলেন—জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার সময় এক এক রাত্রিতে তিনখানি করিয়া পুস্তক অভিনয় করিতে লাগিলেন। শনিবারে দুইখানি বড় পুস্তকের অভিনয় করা দুর্ঘট হইত বলিয়া রবিবারেই প্রায় ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইত। শেষে ইহাই রীতি হইয়া দাঁড়াইল। এমারেল্ড্, মিনার্ভা প্রভৃতিতে নানা অধ্যক্ষের পরিবর্তনে ঐরূপ তিনখানি পুস্তকের অভিনয় প্রতি সপ্তাহেই হইয়া গিয়াছে। এখন আর ইহা নূতন বা বিস্ময়কর কথা নহে। এখন একখানি নাটকের সঙ্গে দুইখানি অপেরা একখানি প্রহসন ও বায়স্কোপ প্রভৃতির ন্যায় একটা রকমারী কিছু জুড়িয়া দিয়া, এক রাত্রিতে চারি পাঁচ প্রকার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা রবিবারের নিত্য কায হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতিযোগিতার জন্যই যে এতটা হইয়াছে, তাহা দেখাইলাম। এক্ষণে ইহাতে অসুবিধা বা ক্ষতি কত তাহা দেখাইব। প্রথম ক্ষতি দর্শকের। অনেকেই নাট্যশালায় অধিক রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্যহানির জন্য বেশী ভয় পান। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা হয়ত আর এখন আমাদের মত প্রাচীন দর্শকের 'তোয়াক্কা' রাখেন না; কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় বুকে বাঁধিয়া কি শনি কি রবিবারে রাত্রি তিনটা পর্যন্ত জাগিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া না আসিলে আর এখন নাটক দেখা হয় না, তাহারপর ছেলেপুলেদের ছাড়িয়া দিয়াও আশঙ্কায় অনেকে সারা হন, অনেকে হয়ত, ছাড়িয়া দেনও না। তারপর দর্শকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তক নির্বাচন হয় না। একখানি শোকান্ত নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে হয়ত একখানি কুৎসিত রসের প্রহসন জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাও অনেকের মনঃপুত হয় না। এই সকল কারণে নাট্যশালারও দর্শক সংগ্রহেও যে ক্ষতি হয় না, এমন নহে।

নাট্যশালার অভিনয়-কালের এইরূপ অসম্ভব বৃদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা

নাট্যশালার কর্তৃপক্ষদের, ক্ষতিযে অধিক, তাহা তাঁহারা কেন যে বুঝেন না তাহা জানি না। তাঁহাদের প্রথম ক্ষতি আমাদের অসুবিধা—অসুবিধা হইলে আমরা আসিব কেন? তাহার পর দর্শকের মধ্যে প্রাচীন বয়স্ক লোকের সংখ্যা যতই কম হউক না, তাঁহাদের বাদ দিলে, অর্থক্ষতি ত' আছেই; তাহার উপর পরিণত-বুদ্ধি, রসগ্রাহী, ভাবুক দর্শকের সংখ্যা, বোধ হয় যুবক অপেক্ষা প্রবীণের শ্রেণীতেই বেশী, সুতরাং এরূপ দর্শক হারাইলে এই সকল ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। অর্থ হয়ত কোন একটা হুজুগে আসিতে পারে কিন্তু যশ পাওয়া যায় না। অর্থোপার্জন ব্যবসায়ের প্রার্থনীয় বিষয় হইলেও এ সকল ব্যবসায়ে যশোলাভ করা সর্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়, প্রবীণ বলিয়া সমজদার দর্শক শ্রেণীকে পরিত্যাগ করিলে, এ ব্যবসায়ে যে সমূহ ক্ষতি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পর যাঁহারা পাঁচটা দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা ও প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রশংসা লাভ, উপদেশ লাভ করাই সর্বত্র সকলের লক্ষ্য থাকে। অর্বাচীনদিগের নিকট "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" বিড়ম্বনার বিষয়। তাহাতে অভিনেতৃবর্গেরও তৃপ্তি হয় না। এজন্যও প্রবীণ দর্শকের সুবিধা সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

আজকাল রবিবার সন্ধ্যার সময় অভিনয় দেখিতে আসিলে একেবারে প্রাতঃস্নানের বেশে তৈল-গামছা লইয়া আসিলেই চলে, কারণ কোথাও রবিবারে ৪ টার কমে অভিনয় শেষ হয় না; কোথাও বা ভোর হইয়া যায়। ষ্টার থিয়েটার এখনও এবিষয়ে সংযত হইয়া চলিতেছেন, এতদ্ভিন্ন এত অধিক রাত্রি পর্যন্ত যদি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন করিয়া অভিনেতৃবর্গকে খাটিতে হয়, তবে তাহাদেরই বা স্বাস্থ্য থাকে কিসে? অভ্যাস হইয়া গেলেও তাহারা অভিনয়ের পরদিন যে পরিমাণে অবসাদ জড়িত থাকে, তাহাতে তাহাদের দ্বারা কি কোন কার্য হইতে পারে? অনেকে পরদিন থিয়েটারে আসিতেই পারে না। অনেক অভিনেত্রী,—আমরা শুনিয়াছি, বীডন ষ্ট্রীটের থিয়েটারে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইলে, দীর্ঘ অভিনয়ের রাত্রিতে থাকিবে না, বা পরদিন ছুটি পাইবে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে

কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। যাহারা একান্ত আসে, তাহাদের দ্বারাও নূতন পুস্তকের শিক্ষা বা পুরাতন পুস্তকের পুনরাবৃত্তি কিছুই সুশৃঙ্খল হয় না; এদিক দিয়া বিবেচনা করিলেও নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের পক্ষেই বেশী ক্ষতি দেখা যাইতেছে।

কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিব। পুস্তকের সংখ্যা ও বিভিন্ন বিষয়ের একত্র সমাবেশে দর্শকগণকে আকর্ষণ করিব—এইরূপ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে গিয়া পরোক্ষে কার্যহানি করা বোধ হয়, কাহারই উচিত নহে। ইহাতে একপ্রকার নিজ নাসাচ্ছেদে পরের যাত্রাভঙ্গ করারই ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আরও এক ক্ষতি আছে—নিম্ন শ্রেণীর টিকিটের মূল্য ।৷৹ আট আনা। এই আট আনার জন্য তিন চারি খানি পুস্তকের অভিনয় দেখান বা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করা কি ক্ষতিকর নহে? যে পুস্তকের একখানি মাত্র অভিনয়েই ।৷৹ পাওয়া গিয়াছে, আজ কেবল ।৷৹ আনায় সেরূপ তিনখানি পুস্তকের অভিনয় দেখান কোন এ-সে বুদ্ধিমানের কার্য নহে। কারণ তাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন কালে সে সকল পুস্তকের অভিনয়ে দর্শক জুটিবে না। কোন পুস্তক পুরাতন হইতে দিতে নাই; দর্শকের আগ্রহ সকল পুস্তকের জন্যই বজায় রাখিতে চেষ্টা করা আবশ্যক নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ এ কথাগুলি প্রণিধান করিলে সুখী হইব। সকল নাট্যশালাতেই একজন না একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ প্রাচীন অভিনেতা আছেন। তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করিবেন।*

দর্শক ও সমালোচক

(১)

যাঁহারা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ, যাঁহারা নাট্যকার, এবং যাঁহারা নাট্যশালার প্রাণ অভিনেতৃ সম্প্রদায়,—নাট্যশালার উন্নতির জন্য ইঁহারা সকলেই যেমন দায়ী, তেমনি নাট্যশালার দর্শক ও সমালোচকবর্গও যে উহার জন্য কতকাংশে দায়ী নহেন, ইহা

---

* এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার কারণ এখন আর বঙ্গীয় নাট্যশালায় বর্তমান নাই। অতএব এ প্রস্তাবের উপসংহার এখানেই করা গেল।

যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা কোন বিষয়ের দুইদিক দেখিতে পটু নহেন। একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

নাট্যশালা হইতে যাহাই কেন করা হউক না, দর্শক ও সমালোচকবর্গের তৃপ্তি-বিরক্তির উপর তাহার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে, ইহা খুব সত্য কথা।* দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এমন কতকগুলি অবস্থাগত কারণ বর্তমান আছে যাহাতে নির্ভরতার কোন ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে দর্শকের রুচির স্বাধীনতা নাই। নাট্যশালা হইতেই সে রুচি গড়িয়া দেওয়া হয়। দর্শক সমাজ তাহারই অনুসরণ মাত্র করেন। কাজেই তাহার সংস্কারের প্রতি—সংস্কারের আবশ্যকতার প্রতিও দর্শক সমাজের দৃষ্টি পড়ে না, অথচ নাট্যশালা আজ ত্রিংশদ্বর্ষাধিক কাল দর্শকেরই রুচির দোহাই দিয়া যত কিছু অপব্যবস্থার সমর্থন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া অবাধে চলিয়া যাইতেছে, আর দর্শক সমাজ নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় এই অন্যায় অভিযোগ অনায়াসে নির্বাকভাবে সহ্য করিয়া লইতেছেন। এই অন্যায় অভিযোগে দর্শক সমাজের প্রতি নাট্যশালার কতটা উপেক্ষা, কতটা তাচ্ছিল্য, কতটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, তাহা দর্শক সমাজ একবারও ভাবিয়া দেখেন না। নাট্যশালার অপ-ব্যবস্থাগুলি দর্শক সমাজ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেন বলিয়াই, নাট্যশালার চক্ষে দর্শক সমাজ মূর্খ, বিবেচনাহীন, বিচারশূন্য জড় পদার্থের ন্যায়। যাঁহাদের অনুগ্রহে নাট্যশালার

---

* এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে যে, দর্শকের রুচির কথা আমাদের দেশে না ভাবিলেই চলিতে পারে, কারণ আমাদের দেশে দর্শকের রুচি বলিয়া একটা পদার্থ নাই। নাট্যশালা হইতে যে রুচি গড়িয়া দেওয়া হয়, দর্শক সমাজ তাহারই অনুসরণ মাত্র করেন—এ কথার সহিত এখানে কোন বিরোধ ঘটিতেছে, একথা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদের দেশে দর্শকের রুচিতে কোন স্বাধীনতা নাই—এ কথাও যেমন সত্য—নাট্যশালার সৃষ্ট রুচিকে দর্শকেরা ইচ্ছা করিলে যে সংশোধন করিতে পারেন, ইহাও তেমনি সত্য—তবে হয় না কেন—তাহাই দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাণরক্ষা হয়, যাঁহাদের চুটকিদানে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের অর্থ লালসা পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাদিগকে এইভাবে অগ্রাহ্য করিবার সাহস নাট্যশালার কিসে হইল, দর্শক সমাজ কি একবারও তাহা ভাবিয়া থাকেন ?

যে বিষয়ে রুচি না হয়, লোকে তাহাতে বিরক্ত হয়, তাহা অগ্রাহ্য করে,—ইহা লোকসিদ্ধ ধর্ম। জননী যত্ন করিয়া সন্তানের তৃপ্তির জন্য যে আহার্য প্রস্তুত করেন, তাহা যদি সন্তানের রুচি সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে সন্তান জননীর যত্ন-স্নেহ ভুলিয়া গিয়া, সে সকলের প্রতি মহা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের প্রতি লোকে বিরক্ত হইলে, তাহার মুখদর্শন করে না। যে সংসারের প্রতি অতিমাত্র মমতা বশতঃ জাল, জুয়াচুরি, খুন করিতেও লোকে কাতর হয় না, সেই সংসারের প্রতি লোকে বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে। লোকসমাজের যখন ইহাই নিয়ম, তখন নাট্যশালা সম্বন্ধে যে সকল অপব্যবহারের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সেগুলি যদি দর্শক সমাজের সাধারণ বিরক্তির কারণ হইত, তাহা হইলে, দর্শক সমাজ নিশ্চয়ই সে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং সমালোচকবর্গও উহার বিরুদ্ধে ভীষণ দণ্ড উত্তোলন করিতেন,—নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থার প্রতি যে সাধারণের কোন বিরাগ নাই, বরং অনুকূলতা আছে, তৎসম্বন্ধে ইহাই নাট্যশালার পক্ষের প্রবল যুক্তি।

নাট্যশালার ঐ যুক্তিটি যতই প্রবল হউক না কেন, নাট্যশালার ধৃষ্টতাও বড় কম নহে। বলিতে লজ্জা করে, দুঃখও হয়,—সম্প্রতি ১৩১৪ সালের পৌষ মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে "দলিতা ফণিনী" নামক নূতন গীতিনাট্যের যে বিজ্ঞাপন (Handbill and Advertisements) বাহির হইয়াছিল, উহাতে লেখা ছিল,—Pretty songs, Pretty dances, Pretty dresses, Pretty scenes and to crown all—A lot of Pretty girls and a galaxy of Oriental Beauties. কোন ভদ্রলোক, (হইলেন বা তিনি নাট্যশালার অধ্যক্ষ)—এমন করিয়া অভিনেতৃবর্গের রূপযৌবনের বিজ্ঞাপন বিলাইয়া যে দু-পয়সা উপার্জন করিতে চাহেন বা ভদ্র সমাজে থাকিয়া এরূপ করিতে সাহস

করেন—ইহা আমাদের ধারণার সীমার অতীত। মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও কর্তৃপক্ষগণকে এই কুৎসিত বিজ্ঞাপনের হেতু যদিই জিজ্ঞাসা করা যায়, তাঁহারা অম্লান বদনে অসংকোচে হয়ত বলিয়া বসিবেন—"পয়সার জন্য যে কোন কৌশলে দর্শক আকর্ষণ করা চাই"—অথবা বলিবেন, "এদেশে দর্শকের রুচিই এত জঘন্য হইয়াছে যে, এরূপ প্রলোভন না দেখাইলে, চারিটি নাট্যশালার প্রতিযোগিতার যুদ্ধে আমরা জয়ী হইতে পারি না"—ইহার উত্তরে যদি দর্শক সমাজ হইতে একটা লোকেও বলে—"কেবল পয়সার লালসায় এতটা নীচ হইয়া যদি কাহাকেও কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়, তবে তাহাকে ধিক। বঙ্গে নাট্যশালার ব্যবসায়ে যদি এতই হীনতা ঘটিয়া থাকে, তবে কাজ কি এমন পোড়া ব্যবসায়ে? এমন অবস্থাতেও এই ব্যবসায় যে করিতে হইবে এমন মাথার দিব্য কে দিয়াছে?—ইহা অপেক্ষা ঐ অর্থে নূতন বাজারে মুদিখানার দোকান খুলিয়া বসিলেও যে ভদ্রতার সঙ্গে দুপয়সা উপার্জন হইবে—দিন চলিয়া যাইবে।"—প্রত্যুত্তরে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ কি বলিবেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না।—আমরাও বলি যে, যে দেশের লোকের রুচি এতই জঘন্য হইয়াছে বলিয়া নাট্যশালার বিজ্ঞ প্রভুরা বুঝিয়াছেন সে দেশের লোকের রুচির অনুসরণ করিয়া শ্লীলতার এতটা নিম্নস্তরে নামিবার প্রয়োজন কি? সে দেশে নাট্যশালারই বা আবশ্যকতা কি? উহা বন্ধ করিয়া দিলেই চলিতে পারে, দেশেরও মঙ্গল হয়। মদ ও বিষ, মাদক ও অনিষ্টকর দ্রব্য বলিয়াই বিক্রীত হয়। কিন্তু নাট্যশালায় আমাদের নামে যদি জঘন্য ব্যাপারের অবতারণা করা হয় তবে তাহা দমন করা অতীব কর্তব্য।

সত্য সত্যই কি দর্শক সমাজ নাট্যশালার উক্তিমত রুচিহীন হইয়াছেন? সত্য সত্যই দর্শকের মধ্যে নাটক বুঝিতে, অভিনয় বুঝিতে, সাজসজ্জার বিসদৃশতা উপলব্ধি করিতে, দৃশ্য পটাদির অসম্বদ্ধতা অনুভব করিতে পারেন, এমন কেহই কি থাকেন না? সত্য সত্যই কি দর্শক সমাজে কেবলমাত্র রমণীবিলাস-লীলা-দর্শন লালসাপ্রমত্ত যুবকের সংখ্যাই অধিক হইয়াছে? তাহা কখনই সম্ভব নহে।

দেশে এখন সাধারণ সাহিত্যের—শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট বাড়িয়াছে। দর্শকের মধ্যে আজকাল যে শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশী, তাহা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। এমন এক সময় ছিল, যখন নাট্য-শালাকে সাহিত্য জ্ঞানবর্জিত শিল্পকলানভিজ্ঞ ধনীর অনুগ্রহের আশায় বসিয়া থাকিতে হইত। আজকাল তাহার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রত্যেক নাট্যশালাকে সচেষ্ট হইতে দেখা যায়;—তাহাদের জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার শেষ দিনে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করিতে হয়।—এই শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীগণ কলেজে টীকা ও ভাষ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ কালিদাস ও শেক্সপীয়ার এই উভয়েরই নাটকগুলি পড়িয়াছেন। নাটক বুঝিবার জন্য তাঁহা-দিগকে নাট্যশালার আলোচনা, নাটকের দোষগুণের আলোচনা, নাটকের চরিত্রও নাট্যকারদ্বয়ের আলোচনা করিতে হয়। সুতরাং নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে নগণ্য মূর্খ বা অপদার্থ বলিয়া প্রচার করিতে চাহিলে নাট্যশালার পক্ষ হইতে দর্শকসমাজে ইচ্ছা করিয়া অবজ্ঞা করাই হইয়া থাকে আর নাট্যামোদ লাভের আশায় আসিয়া নাট্যশালা প্রতিপালনের জন্য অর্থব্যয় করিয়া দর্শকদিগকেও অপমানমাত্র ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়।

না হইবে কেন? পুনঃপুনঃ অত্যাচারে যদি কাহারও চৈতন্য না হয়, অত্যাচারীর পদে দলিত হওয়া ভিন্ন তাহার আর কি গত্যন্তর আছে? দর্শক সমাজ আজ ত্রিশ বৎসরের অধিককাল নাটকাভিনয় দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু নাটকের কথোপকথন শ্রবণ ভিন্ন অভিনয় কিরূপ হইল, সাজপোশাক দৃশ্যপটাদি কিরূপ হইল, নাচগানের ব্যবস্থা কিরূপ হইল, তাহার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। অথবা যাঁহারা করেন, তাঁহারাও নিজ নিজ মতামত সংবাদপত্রদ্বারা নাট্যশালাকে জানান না। কাজেই নাট্যশালাকে অনেকগুলো হাততালির পরিমাণ দেখিয়া দর্শকের তৃপ্তি বিরক্তির পরিমাণ করিতে হয়। আমাদের দেশে কেহ অপকর্ম করিলে লোকে উপহাস করিয়া তাহার পশ্চাতে হাততালি দেয়, পাগল দেখিলে হাততালি দেয়। আমাদের দেশে হাততালি দিয়া ঘৃণা প্রকাশ

করাই রীতি ছিল ; কিন্তু এখন ইংরাজের অনুকরণে আমরা হাততালির মর্য্যাদা বাড়াইয়া লইয়াছি। উহাকে প্রশংসা প্রকাশের উপায় করিয়া লইয়াছি। দেশভেদে যাহার উদ্দেশ্য যাহা নহে, তাহা দ্বারা তাহা করিতে গেলে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। হাততালির দ্বারা আমাদের দেশের রীতি বহির্ভূত প্রশংসা প্রকাশ করিতে গিয়া, আমরা বিপরীত ফল পাইতেছি। যাহাদের প্রশংসার জন্য হাততালি দিই তাহারা তাহাতে ফুলিয়া উঠিয়া, সৌজন্য ও সংশোধনের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে। দর্শকে হাততালি দিলে নাট্য সম্প্রদায় মনে করেন, আর পায় কে? এক এক হাততালিতে তাঁহারা সাত-সাতে উনপঞ্চাশ প্রকার দোষ হজম করিয়া ফেলেন। ইহাতেও দর্শক সমাজের চৈতন্য হয় না। বুদ্ধিমান দর্শকও এ সকল নীরবে সহ্য করেন বলিয়াই, নাট্যশালা রসিকতার নামে ভাঁড়ামি দেখাইয়া, অভিনয়ের পরিবর্তে চীৎকার ও লম্পঝম্প করিয়া, করুণার স্থলে বীভৎস ভঙ্গী, নৃত্যের পরিবর্তে সার্কাসের অঙ্গকৌশল, ভাবাভিনয়ের পরিবর্তে বিকট মুখভঙ্গী দেখাইয়া পার পাইয়া যান। অনেক দর্শক এই সকল বিসদৃশ ব্যাপারে মহা বিরক্ত হইয়া থাকেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু কিছুতেই তাহারা গা-নাড়া দেন না, আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন না,—এ কার্যটাকে মোটেই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। অনেকে সামান্যজ্ঞানে উপেক্ষা করেন, কাজেই নাট্যশালা নিরঙ্কুশ, প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় উদ্দামভাবে চলিয়া যাইতেছে। নাট্যশালার সংস্কার যে আজ ত্রিশ বৎসরেও হইল না, তাহার কারণ দর্শক সমাজের এই উপেক্ষা। সংস্কার দূরে থাক অধিকন্তু দর্শক সমাজ নাট্যশালার নিকট 'বেওকুফ' ও 'গাড়ল' হইয়া আছেন। দর্শকের মধ্যে গায়ক আছেন, নর্তক আছেন, চিত্রকর আছেন, ঐতিহাসিক আছেন, কবি আছেন, রসজ্ঞ, ভাবজ্ঞ, নাট্যকলাভিজ্ঞ প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক আছেন ; কিন্তু কেহই যদি আপন আপন অভিজ্ঞতার দিক হইতে নাট্যশালার ন্যায় দেশের এতবড় প্রতিষ্ঠানটার দোষগুণের আলোচনা না করেন, সংস্কার সংশোধনের প্রস্তাব না করেন, উন্নতির উপায় বলিয়া না দেন, তবে ইহা কেন না অধঃপাতে যাইবে, আর ইহার অদূরদর্শী নেতৃগণের হস্তে দর্শক সমাজের প্রতি অবজ্ঞা উপেক্ষা কেন না বর্দ্ধিত হইবে?

কেন এমনটা হয়? দর্শক সমাজ এতটা নিশ্চেষ্ট কেন?—তাহার কারণও আমরা বুঝিয়াছি। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষরা শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তি-বিরক্তির প্রতি নির্ভর করিতে চাহেন না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য একমাত্র অর্থোপার্জন। তাঁহারা নাটক দেখেন না, অভিনয় দেখেন না, সাজ-পোষাক, দৃশ্যপটাদি কিছুই দেখেন না—বিস্তর পয়সা ব্যয় করিয়া কোন রকমে জাঁক-জমক ও আড়ম্বর সহকারে কতটা হাস্যরসের অবতারণা করিতে পারিলেই, তাঁহারা অল্পবুদ্ধি দর্শকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় দেখিয়া, আন্তরিক যত্নে কেবল সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। যে যেমন সাধনা করে, তাহার তেমনই সিদ্ধিলাভ হয়। শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা সেইজন্য দর্শক সমাজে থাকিলেও এত বেশী হয় না যে, তাহাদের প্রতিবাদ অধিকাংশের প্রশংসা-বাদেও ভাসিয়া যাইবে না; কাজেই বিরক্ত হইয়াও অধিকাংশ স্থলে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি নাট্যশালার ব্যবহারের ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা কহিতে চাহেন না। অনেক শিক্ষিত দর্শক আবার এতটা ভাবপ্রবণ যে, তাঁহারা নাটকের কোন না কোনভাবেই মত্ত হইয়া পড়েন—নাটকের বর্ণনা বা অভিনয় কিছুই তাহাদের কর্ণে বা নয়নে স্থান পায় না। ইহারা প্রহ্লাদের বিপদে, 'বলিদানের' ঘটনাবলীতে, 'মীরকাসেমের' উভয়সংকট অবস্থায়, নন্দকুমারের বাধিকায় ভাবে ভরা বাক্যাবলীতে এতটা মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে ষণ্ডামার্কা ভাঁড়ামি, দুলালচাঁদের বেল্লিকপনা, তারার অন্যায় ও অসঙ্গত আবির্ভাব-তিরোভাব, চৈতন্যচরণের অসহনীয় ন্যাকামি প্রভৃতি কিছুই ধারণা করিতে পারেন না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসারে ইহারা নাটক দর্শনেরই অনধিকারী। এই শ্রেণীর দর্শক সঙ্কীর্তনের ভাবের উচ্ছ্বাসে বিপুল আনন্দলাভ করেন, যাত্রা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। কিন্তু ভাবের নিম্নে নামিলে পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। নাট্যশালায় অভিনয় দেখা ইহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র; কিন্তু নাট্যশালার কর্তৃপক্ষবৃন্দ ইহাদেরই মুগ্ধভাবের দোহাই দিয়া আপনাদের কৃতিত্ব প্রচার করিতে ক্রটি করেন না। এরূপ ভাবমুগ্ধ দর্শকশ্রেণীদ্বারা নাট্যশালার সংস্কারকল্পে কোন সাহায্যের আশা নাই। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত দর্শক আছেন, তাঁহারা অতি ক্ষমাশীল;

তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা নাট্যশালার অনেক বিষয়েই বিরক্ত ; কিন্তু এতটা ক্ষমাশীল যে ও কথার আলোচনা উত্থাপন করিলেই —তাঁহারা বলেন,—আর কি হবে, অভিনেতৃবর্গের ও কর্তৃপক্ষগণের যেমন বিদ্যা-বুদ্ধি, যেমন শিক্ষা-দীক্ষা তাহার পক্ষে যাহা উঠিয়াছে, তাহা বেশ করিয়াছে, উহাদের কাছে আর বেশী আশা করিলে অসঙ্গত হইবে। ইহাদের কথাগুলো বিবেচিত হইলেও ইহাতে কোন ফল হয় না—না হয় দর্শক সমাজের তৃপ্তি, না হয় নাট্যশালার সংস্কার। আরও একপ্রকার আমোদ লিপ্সু বিজ্ঞ দর্শক আছেন,—তাঁহারা বলেন, নাট্যশালায় অতটা সাহিত্য, অতটা কাব্যরস, অতটা শিল্প-বিজ্ঞানের খুটিনাটিই যদি দেখিতে যাইতে হয়, তাহা হইলে আর নাট্যামোদটুকু উপভোগ করা হয় না। ও সকল ব্যাপারে সমালোচকের অধিকার, আমরা পয়সা দিয়া আমোদ করিতে যাই, দুটা নাচ, গান রসিকতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু কাব্যরস উপভোগ করিয়া চলিয়া আসি, ব্যবচ্ছেদকের ছুরি হাতে সতর্ক হইয়া বসিয়া অভিনয় দর্শন করিতে হইলে, ডাক্তারের ন্যায় দেহের সৌন্দর্য্য, লাবণ্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় কেবল মেদ, মাংস, অস্থি, রস, রক্ত, বসা প্রভৃতি পুতিগন্ধময় পদার্থ।—আজকালকার উকিল, কবি লেখক প্রভৃতি শ্রেণীর শিক্ষিতবর্গের মধ্যে এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের কথাতেও সায় আছে—কিন্তু যে কাব্যরস উপভোগের জন্য তাঁহারা যান, উপর উপর দুটা কথোপকথন শুনিয়া, দুটা গান, দুটা রসিকতা শুনিয়া, দুটা নাচ দেখিয়া, তাহা উপভোগ হয় কি? নাট্যকাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ যে সকল উপাদানের সুসঙ্গতির উপর নির্ভর করে, সে সকল উপাদানেই যদি অসঙ্গতি থাকে, তবে সে কাব্যের রস বিকাশ পূর্ণমাত্রায় হইবে কেন? "জনা" নাটকের গঙ্গারক্ষকদ্বয় চূণ, কালী, সিঁদুর মাখিয়া শিশু ও রমণীর ভীতি উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু কাব্যাংশে গঙ্গার মহিমা প্রকাশে বা গঙ্গার প্রতি ভক্তি উদ্রেক অথবা নাটক বর্ণিত ঘটনাবলীর বিকাশকল্পে কতটা সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা কি একেবারেই দর্শনীয় নহে?—তাহাদের খেলো ইয়ারকির দুটা কথা শুনিয়া

অতি নিম্ন স্তরের সামান্য একটু হাসি হাসিতে পারিলেই যে শিক্ষিত সমাজ পরিতৃপ্ত হন, আমরা কখনই তাহা মনে করি না। তর্কস্থলে যদি কেহ একথা বলেন, তিনি আত্মপ্রতারণা করিবেন এবং আপনার অক্ষমতা চাপা দিবার জন্য উহা বলিবেন মাত্র। এরূপ দর্শকই নাট্যশালার বেশী অনিষ্টকারী। আরও এক শ্রেণীর দর্শক আছেন, তাঁহারা শিক্ষিত হইলেও অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ সুতরাং একদেশদর্শী। ইহারা যেটুকু বুঝেন, সেইটুকু ভিন্ন অন্য দিকে কি হইতেছে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। গীতজ্ঞ বা গীতপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যাই এই শ্রেণীতে অধিক। গানের সুর ঠিক হইল কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে এবং কতকগুলা গান শুনিতে পাইলে অথবা অভিনেতৃ বিশেষের গান শুনিতে পাইলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন, এরূপ দর্শকশ্রেণী যতই কেন শিক্ষিত হউন না, ইঁহাদের দ্বারা নাট্যশালার অর্থ বৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন উপকারই নাই। ইঁহাদের তৃপ্তি-বিরক্তির উপর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নির্ভর করে না। এই শ্রেণীতে গীতজ্ঞ বা গীতপ্রিয়ের সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনি চিত্রবিদ্যাপট বা চিত্রদর্শনার্থীর সংখ্যা নাই বলিলেই চলে।

দর্শক সমাজের রুচিভেদে ভাবভেদে শ্রেণীভেদ আর করিবার আবশ্যক নাই। মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, দোষ এক নাট্যশালার নহে, দর্শকেরও আছে। দর্শকের পক্ষে বলিবার কথা, ওকালতি করিবার কথা, যাহা কিছু ছিল, তাহা আমরা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ যে দর্শকের রুচির দোহাই দিয়া সমস্ত দোষ হজম করিবেন, আর দর্শক সমাজ এখনও পূর্বের ন্যায় তাহা সহ্য করিবেন, ইহা আমাদেরও অসহ্য। পরাপরাধে পরাপমান কোন স্থানেই সহ্য হয় না। আমরাই বা সহ্য করিব কেন? নিজের কষ্টার্জিত অর্থের সামান্য সঞ্চয় হইয় হইতে একাংশ ব্যয় করিয়া, নাট্যামোদ উপভোগ করিতে গিয়া, নাট্যশালার যাবতীয় যথেচ্ছাচার সহ্য করিয়া আসিব আর তাহার অসঙ্গতির জন্য আমাদেরই রুচিকে দায়ী করা হইবে ইহা সহ্য করিব কি জন্য? এতটা ক্ষমাশীল হইব কেন? নাট্যশালাকে এতটা সমীহ

করিয়া চলিতে হইবে কেন তাহা বুঝিতে পারি না। এখনও যদি দর্শকসমাজ নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হইবে না।

নাট্যশালার অধঃপতনের জন্য আর এক শ্রেণীর দর্শক, সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও, সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। ইহারা সংবাদ পত্রের সম্পাদক, রিপোর্টার ও সমালোচকবর্গ। ইহারা রাজনীতির সমালোচনা করেন, রাজপুরুষগণের ভ্রম-প্রদর্শন করেন। রাজবিধির পরিবর্তনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তি-তর্কের সাহায্যে মহা বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত করেন; এমন কি, অনেক স্থলে শিমুলগাছে গা ঘসিবার ফল জানিয়াও তাহাতে পরান্মুখ হন না! ইহারা সমাজনীতিরও আলোচনা করেন। যে সমাজের নেতা নাই সে সমাজের জন্য ইহারা মাথা কুটিয়া মরেন, কিন্তু সাহিত্য, নাটক, নাট্যশালা,—যাহার সমালোচনা করিলে, হাতে হাতে ফল পাইবার আশা আছে, তাহার সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন থাকেন,—এ রহস্য আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। এই ঔদাসীন্যের জন্য তাঁহারা নিজের কর্তব্যের ত্রুটিত পদে পদেই করিতেছেন, অধিকন্তু নাট্যশালায় কর্তৃপক্ষের নিকট অনেক কুৎসিত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন; ইহাতে তাঁহাদের আত্ম-প্রসাদ কিরূপে অক্ষুন্ন থাকে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বহু অনুসন্ধানে আমরা ইহার একটা কারণ দেখিতে পাইয়াছি। সম্পাদক দল নিমক্‌হারামি করেন না—করিতে চাহেন না। অন্য শত ত্রুটি করিতে হয়, তাহাও স্বীকার তথাপি নিমক্‌হারামি ইহারা কিছুতেই করিবেন না। প্রত্যেক নাট্যশালা হইতে প্রত্যেক সংবাদপত্রের কর্মচারিবৃন্দ বিনামূল্যে অভিনয় দর্শনের অনুজ্ঞালিপি চিরকাল পাইয়া থাকেন। ইহার উপর আবার প্রয়োজন মত এইরূপ অনুগ্রহের পরিমাণ, প্রার্থনা করিয়া বাড়াইয়া লওয়া হইয়া থাকে; কাজেই যেখানে এত অনুগ্রহ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ,—এতটা বাধ্যবাধকতা বর্তমান—সেখানে সত্য কথা বলিয়া নাট্যশালার ত্রুটি প্রদর্শন করিতে কোন সম্পাদকই প্রস্তুত নহেন, আজকাল মধ্যে মধ্যে একমাত্র ‘বঙ্গবাসী’তে ছাড়া নাট্যাভিনয়ের ঢালাও সুখ্যাতি ছাড়া সমালোচনার চক্ষে কোথাও কিছু লেখা

হয় না। যাঁহারা লাটসাহেবের ভুল সংশোধনে সর্বদা উদগ্রীব তাঁহারা নাট্যশালার দোষ সংশোধনে কেন যে পরাঙ্মুখ, তাহার রহস্য বুঝা সাধারণের পক্ষে একটু কঠিন হইয়া পড়ে। সম্পাদকদল অন্য সকল বিষয়ে সবজান্তা হইয়া মতামত প্রকাশে সর্বদা প্রস্তুত এবং সকলের অগ্রণী, কেবল নাট্যাভিনয় ও সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনায় তাঁহাদের ন্যায় পশ্চাৎপদ বোধ হয় আর কেহ নাই। এতদিন যদি সমালোচনায় নিকষ-পাষাণে নাট্যশালার প্রত্যেক অভিনয় এবং নাটক কষিয়া লওয়া হইত তাহা হইলে কি বঙ্গসাহিত্যে নাটক নামে এতগুলা আবর্জনা প্রবেশ করিতে পারিত, না সেগুলার অভিনয় হইত? সংবাদপত্রের সমালোচনার আশঙ্কা না থাকায় নাট্যশালা অতিমাত্র সাহসী হইয়া, যাহা খুসী তাহাই করিয়া, অবাধে সাধারণের উপর আপনাদের অত্যাচারের চিরস্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছেন। সম্পাদকদল মহা গণ্ডগোল করিয়া বলেন, রাজপুরুষকে রাজবিধি হাতে লইয়া আমাদিগের সামাজিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে—কিন্তু তাহারা সেই সকল সমাজবিধি সংস্কারে যত্ন না করিলে, উৎপীড়িত সমাজ রাজদ্বারে দাঁড়াইবে না ত' কোথায় যাইবে? এই নাট্যশালা সম্বন্ধেই একটা উদাহরণ দিতেছি—বীডন ষ্ট্রীটের নাট্যশালাগুলিতে যখন অল্পে অল্পে একখানির স্থলে দুইখানি ক্রমে তিনখানি, চারিখানি পুস্তকের অভিনয় প্রথা প্রচলিত হইল, একটা রাত্রির স্থলে রবিবার বেলা ২টা হইতে শেষ রাত্রি পর্যন্ত যাত্রা গাহিবার ব্যবস্থা হইল তখন কোন সংবাদপত্র কোন দিন তাহার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলেন নাই। কাজেই এখন দর্শক সমাজ এই নিয়মে অতিমাত্র উৎপীড়িত হওয়ায়, মিউমিসিপ্যালিটি নব প্রস্তাবিত অভিনয় বিধিতে অভিনয়ের সময়ের মাত্রা বাঁধিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আমাদের এই সামাজিক ব্যাপারে এই যে রাজবিধির প্রবর্তন ইহা কাহাদের অমনোযোগিতার ফল? সাধারণ মত প্রচারক সাধারণের মুখপাত্র সংবাদপত্র-সম্পাদকদলের নহে কি? সাধারণ দর্শকের নিকট হইতে তাহাদের তৃপ্তি-বিরক্তি যে প্রকাশ পায় না, তাহার জন্যও আমরা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দায়ী বলিয়া মনে করি।

সাধারণের মতামত সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে হইলে সংবাদপত্রকেই যান-বাহনের কার্য করিতে হয়। কিন্তু সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ নাট্যশালা সম্বন্ধে এতটা নির্বাক যে, বাহিরের লোকের লিখিত কোন সমালোচনাও তাহারা পত্রস্থ করিতে প্রস্তুত নহেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক 'রঙ্গালয়' নামে পত্রখানি দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও কখনও রঙ্গালয়ের সমালোচনা স্থান পায় নাই। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের কথা—আশ্চর্য কর্তব্য বুদ্ধির কথা আর কি হইতে পারে? বিনা মূল্যে কয়েকখানি অভিনয়-দর্শন লিপি প্রদান করিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের মুখে চৌরকুক্কুরন্যায়ানুসারে যেন মাংস খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের মুখবন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহাদিগকে এই নিস্তব্ধতার জন্য বা কেবল প্রশংসাবাদের জন্য পরোক্ষে বিদ্রুপ করিতেও ছাড়েন না, এমনও দেখা গিয়াছে। কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার পরও যদি বিনামূল্যে কোন নাট্যশালায় প্রবেশাধিকার না পান তখনি তাহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ অনুজ্ঞালিপি পাঠাইয়া দিয়া তাহার মুখবন্ধ করেন। ক্লাসিক থিয়েটারের দিন হইতে এই প্রথার আরও একটু পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে রাগে হউক, দুঃখে হউক, প্রশংসায় হউক, মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে নাট্যশালার কথা স্থান পাইত, নূতন ব্যবস্থার পর হইতে তাহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত দুই চারিখানি নাটকের সমালোচনা বাহির হইবার পর, তাহার অধ্যক্ষ সেই সকল সমালোচকের বিরুদ্ধে মানহানির ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবীতে নালিশ করেন। সমালোচনার দায়ে পুলিশে ছুটাছুটি করা কোন সম্পাদক যুক্তি সিদ্ধ মনে করিলেন না। কাজেই আজ পাঁচ ছয় বৎসর কাল অভিনয় আলোচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সম্পাদকগণের নিশ্চেষ্ট ভাবের অনুকূলে ইহা একটা প্রবল কারণ হইলেও আমরা বলিব—তথাপি কর্তব্য বুদ্ধি ত্যাগ করা উচিত নহে। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের লোক বুঝিয়াছে সংবাদপত্রের শক্তি কত বলিষ্ঠ—কতটা

ফলদায়িনী। এই শক্তিকে নাট্যশালার উন্নতি কল্পে পরিচালিত না করিয়া মূঢ় করিয়া রাখিলে তাহাতে প্রত্যবায় আছে।

উপসংহার

(১০)

নাট্যশালা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমরা আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা হইতে অনেক কথাই বলিয়া আসিলাম। ব্যবসায়ের দিক্ হইতে এবং কলাবিদ্যার দিক হইতে যতটা সাধ্য সামঞ্জস্য করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা নাট্যশালার হিতৈষী, উন্নতিকামী। উহার দোষ অনুসন্ধান করিয়া উহার সংস্কার করিতেই ইচ্ছুক, ছিদ্রান্বেষী হইয়া উহার নিন্দা করিবার জন্য এত কথা বলি নাই। নাট্যশালার বহুভাগ্য যে উহার জন্মদাতাদিগের মধ্যে এখনও দুই চারিজন অভিজ্ঞও প্রবীণ শিক্ষক বাঁচিয়া আছেন, কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। ইচ্ছা করিলে অনায়াসে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার এবং বহুদর্শিতার ফল পাইতে পারেন। নবীন অধ্যক্ষেরা প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া প্রতি মুহূর্তে অন্ধকার ও বিভীষিকা দেখিয়া যা তা ব্যবস্থা করিতে গেলে, এখনকার এই থোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়ি থোড় গোছের ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে অন্য তরকারী মিশাইলে যে ব্যঞ্জনটি উপাদেয় হইবে তাহার ধারণাও করিতে পারিবেন না। প্রাচীন শিক্ষকদিগের উপর বিশ্বাস করা চাই। তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা চাই নতুবা কেবল তাঁহাদিগকে বেতন দিয়া আটকাইয়া রাখিলে বা একজন সাধারণ অভিনেতার মত তাঁহাদের দ্বারা অভিনয় করাইয়া লইলে কোন ফলই হইবে না।

উপসংহারে এইটুকু বক্তব্য—নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা শিক্ষকেরা অবহিত হউন কেবল পয়সা না দেখিয়া ব্যবসায়টির শ্রীবৃদ্ধির প্রতিও লক্ষ্য রাখুন তবেই সুফল পাইবেন। আর দর্শকেরাও অবহিত হউন,—তাহারা যখন পয়সা দিয়া নাট্যরস উপভোগের জন্য তৃপ্তিলাভের জন্য অভিনয় দর্শনে যান, তখন নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ

গণের যদৃচ্ছাপ্রদত্ত ব্যবস্থায় কেন সন্তুষ্ট থাকিবেন,—স্পষ্ট কথায় এখন হইতে আপনাদের তৃপ্তি-বিরক্তি জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করুন,—দেখিবেন, অল্পদিনেই নাট্যশালার উন্নতি হইবে। আমরা কাহারও শত্রু নহি, কাহারও মিত্র নহি—জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকামনা ব্যতীত আমাদের অন্য স্বার্থ নাই, সুতরাং এই আলোচনাগুলিতে কেহ দ্বেষ, হিংসা নিন্দার আঘ্রাণ লইতে আসিবেন না। যেগুলি দোষ বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি—এবং স্থলবিশেষে যে দোষগুলি যে ভাবে যাহাদ্বারা সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়াছি—তাহা আমরা স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিয়াছি। ইহার জন্য কেহ আমাদের দোষী করিলে আমরা নাচার।

আমাদের সকল কথাই বলা হইল; সত্য কথা বলিতে গিয়া নাট্যাধ্যক্ষ, দর্শক ও সমালোচক বৃন্দকে অনেক অপ্রিয় কথা শুনাইতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু তাহাতে কোন অসত্য কথা নাই বলিয়া, আমার বোধ হয়, কোন শ্রেণীরই ক্রোধের পাত্র হইব না। সমাজ-শরীরের নানা স্থানে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। চিকিৎসা দ্বারা তাহা আরোগ্য করিতে হইলে, নির্মম হইয়া অনেক স্থলে ছুরিকা বসাইতে হইবে বৈকি, আর তাহার জন্য আত্মীয়গণের যে আর্তনাদ, যে যন্ত্রনা, যে বিরক্তি অবশ্য ঘটিবে, তাহা সহ্য করিতে হইবে। আমরা নিন্দুক বা হিংসুক নহি। সাহিত্যের নামে, কলাবিদ্যার নামে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে সংস্কারকল্পে যাহা কিছু বলা উচিত মনে হইয়াছে, তাহাই এই পুস্তকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আশাকরি, আমাদের সদিচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ, নাটককারগণ, দর্শকগণ, ও সমালোচকগণ এ বিষয়ের উন্নতিকল্পে অবহিত লইলে আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ দর্শকের রুচির দোহাই দিয়া যখন স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছেন, তখন দর্শকদিগকে সর্বপ্রথমে আপনাদের তৃপ্তি-বিরক্তির কথা সাধারণে প্রচার করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। সমালোচকবর্গ নাট্যশালার সহিত যতই কেন বাধ্য-বাধকতা বজায় রাখিয়া চলুন না, 'সাধারণের মতামতের

জন্য দায়ী নহেন' বলিয়া দর্শকগণের প্রেরিত সমালোচনাও যদি প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট উপকার করা হয়।

অবশেষে উপসংহারে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—আমাদের কথাগুলি সকলে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলে সুখী হইব। নাট্যশালা কেবলমাত্র ব্যবসায়ের স্থল নহে—ইহা সাহিত্যকলার একাংশ, আর সেই জন্যই—সাহিত্যে আবর্জনা বিস্তর বাড়িতেছে বলিয়াই আমাদের এই ক্রন্দন। পূর্বে এ কথা বলিয়া আসিয়াছি শেষেও আবার স্মরণ করাইয়া দিলাম। অলমতি বিস্তারেণ !

প্রসঙ্গ কথা :

নাট্যকার : ক্ষেত্র গুপ্ত

নাটক : বিষ্ণু বসু

নাট্যশালা : বিষ্ণু বসু

আলোচনা—এক : ক্ষেত্র গুপ্ত

আলোচনা—দুই : বিষ্ণু বসু

নাট্যকার

অতুলকৃষ্ণ মিত্র। জন্ম ১৮৫৭-মৃত্যু ১৯১২ খ্রীঃ। নাট্যকার ও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে সমকালে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি মিনার্ভায় এবং কোহিনূর থিয়েটারের সঙ্গেও এক সময়ে জড়িত ছিলেন। গীতিনাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধকচরিত মালা' গ্রন্থে তাঁর লেখা ৩৪টি মৌলিক নাটকের এক তালিকা দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাস (১৮৭৬), কনকপ্রতিমা (১৮৭৮), অপ্সর কানন (১৮৮০), ভীষ্মের শরশয্যা (১৮৮৫), বাপ্পারাও (১৯০৫), শিরি-ফরহাদ (১৯০৬), তুফানি (১৯০৮), হিন্দা-হাফেজ (১৯০৮), পাষাণে প্রেম (১৯১০), প্রভৃতি।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯১৬। প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেছিলেন। বিখ্যাত নাটক: থিয়েটার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (১৯০৫), দলিতা ফনিণী (১৯০৮), কেয়া মজাদার (১৯০৯) প্রভৃতি। বিখ্যাত ভূমিকা হরিরাজ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি। নাট্য-প্রযোজনায় কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। নাট্য পত্রিকা রঙ্গালয়, নাট্যমন্দির পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

অমৃতলাল বসু। জন্ম ১৮৫৩-মৃত্যু ১৯২৯। অভিনেতা, মঞ্চাধ্যক্ষ ও নাট্যকার হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারে কাজ করেন। রঙ্গালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়মনিষ্ঠ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি নানা রসের তিরিশখানার মতো নাটক লেখেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রহসন রচনায়ই তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন হ'ল—তিলতর্পণ নাটক (১৮৮১), ডিস্‌মিশ (১৮৮৩), চাটুজ্জে ও বাঁড়ুজ্যে

(১৮৮৪), বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০), বাবু (১৮৯৪), একাকার (১৮৯৫), বৌ-মা (১৮৯৭), খাসদখল (১৯১২), ব্যাপিকা বিদায় (১৯২৬)।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৯১২ খ্রীঃ। নাট্যশালার অধ্যক্ষ, পরিচালক, অভিনয়-শিক্ষক ও অভিনেতা হিসেবে ১৮৭৪ থেকে আমৃত্যু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক প্রভৃতি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৌরানিক, ভক্তিমূলক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য "গিরিশ রচনাবলী" ১ম খণ্ডে ৭৭টি পূর্ণাঙ্গ নাটকের একটি তালিকা দিয়েছেন। এর প্রথমটি ১৮৭৭ সালে এবং শেষেরটি ১৯১১ সালে রচিত হয়েছিল। রাবণবধ (১৮৮১), লক্ষণ বর্জন (১৮৮১), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮৩), চৈতন্যলীলা (১৮৮৪), নিমাই সন্ন্যাস (১৮৮৫), বুদ্ধদেবচরিত (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গলঠাকুর (১৮৮৬), প্রফুল্ল (১৮৮৯), হারানিধি (১৮৮৯), ম্যাকবেথ (অনুবাদ) (১৮৯৭), আবুহোসেন (১৮৯৩), জনা (১৮৯৩), মায়াবসান (১৮৯৭), পাণ্ডবগৌরব (১৯০০) বলিদান (১৯০৫), সিরাজদ্দৌলা (১৯০৫), মীরকাসিম (১৯০৬), ছত্রপতি (১৯০৭), শাস্তি কি শান্তি? (১৯০৮), শঙ্করাচার্য (১৯০৯), অশোক (১৯১০), তপোবল (১৯১১) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত নাটক। নাট্যপ্রয়োগকর্তা, অভিনেতা এবং নাট্যকার হিসেবে তিনি সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং ব্যাপক প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ১৮৪৯—মৃত্যু ১৯২৫ খ্রীঃ। সখের নাট্য প্রযোজনায় খুব উৎসাহী ছিলেন। একসময়ে পেশাদারী থিয়েটারে এঁর অনেক-গুলি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। নাট্যানুবাদে তাঁর দান প্রচুর। 'উত্তর-চরিত, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, শকুন্তলা প্রভৃতি ১৮ খানা প্রধান সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। মলেয়ারকৃত দুখানি প্রহসন, সেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজর প্রভৃতি নাটকেরও সার্থক অনুবাদ করেন। তাঁর মৌলিক নাটক

পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯), স্বপ্নময়ী (১৮৮২) ইতিহাসাশ্রিত স্বদেশ প্রেমমূলক ট্র্যাজেডি। মলেয়ারের আদর্শে তিনি কয়েকটি কৌতুকনাটকও রচনা করেন।

তারাচরণ শিকদার। 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২ খ্রীঃ) নামক নাটক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মৌলিক নাটক। সুভদ্রা-অর্জুনের প্রণয় ও বিবাহ সম্পর্কিত মহা-ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। নাটকটির ভূমিকায় লেখক সংস্কৃত আদর্শ পরিহার করে ইংরেজী নাটকের আদর্শ অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র। জন্ম ১৮৩০, মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রীঃ। নাট্যগ্রন্থাবলী : নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাইবারিক (১৮৭২), কমলেকামিনী (১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হলে এঁর লেখা নাটকগুলিই প্রধানত অবলম্বন ছিল। পরবর্তীকালেও এঁর নাটকগুলির মঞ্চাভিনয় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করত। বাস্তববাদী এবং ব্যঙ্গ শিল্পী হিসেবে দীনবন্ধু সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জন্ম ১৮৬৩—মৃত্যু ১৯১৩ খ্রীঃ। গিরিশচন্দ্রের সমকালীন বিশিষ্ট নাট্যকার। স্বতন্ত্র ধারায় নাট্য রচনা করেন। এঁর নাটক-গুলি এ সময়ের এবং পরবর্তীকালের বহু পেশাদারী থিয়েটারে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। শিক্ষিত সাহিত্যরসিকদের কাছেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর নাটকগুলি—একঘরে (১৮৮৯), বিরহ (১৮৯৭), পাষাণী (১৯০০), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রহসন (১৯০২), তারাবাঈ (১৯০৩), প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), সোরাবরুস্তম (১৯০৮), সীতা (১৯০৮), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), পুনর্জন্ম (১৯১১), পরপারে (১৯১২), ভীষ্ম (১৯১৪), সিংহল বিজয় (১৯১৫), বঙ্গনারী (১৯১৬)। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখান।

মধুসূদন দত্ত। জন্ম ১৮২৪—মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রীঃ। নাট্যগ্রন্থাবলী : শর্মিষ্ঠা-নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪)। বেলগাছিয়া থিয়েটার (একটি বিশিষ্ট সখের থিয়েটার) মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার বিকাশে কতকটা সাহায্য করেছিল। মধুসূদন বাংলা নাটকে ইংরেজী আদর্শের প্রবর্তন করেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন। জন্ম ১৮৩১—মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রীঃ। ইতিহাস, গল্প আখ্যান জাতীয় গ্রন্থের লেখক। "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৭২) বাংলা সাহিত্যের অতি প্রাচীন ইতিহাস। এর মধ্যে পূর্ববর্তী ও সমকালীন কয়েকজন নাট্যকারের ও নাটকের আলোচনাও পাওয়া যায়। তিনি আর্যক্ষেমীশ্বর প্রণীত সংস্কৃত 'চণ্ড কৌশিক' নাটক অবলম্বন করে 'কুপিত কৌশিক' নাটক রচনা করেন (১৮৭৮), ভবভূতির 'মহাবীর রচিত' নাটকের কাহিনী অংশ অবলম্বন করে লেখেন 'রামচরিত' (১৮৮৩)।

রামনারায়ণ তর্করত্ন। জন্ম ১৮২২—মৃত্যু ১৮৮৬ খ্রীঃ। বাংলা নাটকের প্রারম্ভকালের বিশেষ খ্যাতিমান লেখক। কলকাতার সখের থিয়েটারগুলির একটা বড় অবলম্বন ছিল রামনারায়ণের নাটকগুলি। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর মৌলিক নাটক-প্রহসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৬৫), নবনাটক (১৮৬৬), উভয়সঙ্কট (১৮৬৯), চক্ষু দান (১৮৬৯), রুক্মিনীহরণ (১৮৭১), ধর্মবিজয় (১৮৭৫)।

হরচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ১৮১৭—মৃত্যু ১৮৮৪ খ্রীঃ। একেবারে প্রথম দিকের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। ইনি শেক্‌সপিয়রের একাধিক নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। নাটক—ভানুমতী-চিত্তবিলাস (১৮৫৩), কৌরববিয়োগ নাটক (১৮৫৮), চারুমুখ-চিত্তহরা (১৮৬৪), রজতগিরিনন্দিনী (১৮৭৪)।

নাটক

অবলাব্যারাক—প্রহসন। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। সম্ভবত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল। প্রহসনটিতে দুটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য আছে। প্রহসনটি কার লেখা সঠিকভাবে জানা যায় না। পুস্তকটির যে কপি চৈতন্য লাইব্রেরীতে আছে তার টাইটেল্ পৃষ্ঠা নেই। অবশ্য দেবকুমার বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত "বাঙলা নাটক ১৮৫২—১৯৫৭" নামক গ্রন্থে প্রহসনটির লেখক হিসেবে রাখালদাস ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করা আছে।

অশোক—নাট্যকার : গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ঐতিহাসিক নাটক। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : বিন্দুসার—ননীলাল দত্ত। সুসীম ও জনৈক জৈন—অহীন্দ্রনাথ দে। অশোক—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। বীতশোক—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কুণাল—সুশীলাবালা। মহেন্দ্র—শ্রীমতী শশীমুখী। ন্যগ্রোধ- সরোজিনী। কহ্লাটক—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। রাধাগুপ্ত—প্রমথনাথ পালিত। আকাল—তারকনাথ পালিত। উপগুপ্ত—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য। মার—প্রিয়নাথ ঘোষ। চণ্ডগিরিক, ২য় বৌদ্ধ ও ১ম রাজপারিষদ—মৃত্যুঞ্জয় পাল। ১ম বৌদ্ধ, আভীর ও তক্ষশীলার মন্ত্রী—অটলবিহারী দাস। তক্ষশিলার সভাপতি—সত্যেন্দ্রনাথ দে। তক্ষশিলার সেনাপতি ও পাটালিপুত্রের ২য় রাজপারিষদ—নরেন্দ্রনাথ সিংহ। তক্ষশিলার ১ম সদস্য ও প্রথম ঘাতক—উপেন্দ্রনাথ বসাক। তক্ষশিলার ধর্মযাজক—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। তক্ষশিলার দূত—ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়। ২য় ঘাতক—জিতেন্দ্রনাথ দে। চণ্ডাল সর্দার—হরিদাস দত্ত। ১ম ব্রাহ্মণ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী। ২য় ব্রাহ্মণ—মধুসূদন ভট্টাচার্য। পাটালিপুত্রের দূত—মন্মথনাথ বসু। বৌদ্ধ উপাসকগণ—ননীলাল বন্দোপাধ্যায়, পান্নালাল সরকার প্রভৃতি। সুভদ্রাঙ্গী—সরোজিনী। চন্দ্রকলা ও কাঞ্চনমালা—নীরদাসুন্দরী। পদ্মাবতী—তারাসুন্দরী। দেবী—হেমন্ত-

কুমারী। সঙ্ঘমিত্রা—ফিরোজাবালা। চিত্তহরা—চারুশীলা। তৃষা—তিনকড়ি (ছোট)। চণ্ডালপত্নী—রাধারাণী। আভীর পত্নী ও পরিচারিকা—নলিনীবালা।

এ ছাড়া অন্যান্য দায়িত্বে ছিলেন—

শিক্ষক—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য ও মহেন্দ্রকুমার মিত্র। সঙ্গীত শিক্ষক—দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি। নৃত্য শিক্ষক—সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। রঙ্গভূমি সজ্জাকর—কালিচরণ দাস।

[মন্তব্য: অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় উল্লিখিত তালিকা দিয়েছেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তালিকার সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের তালিকার কিছু পার্থক্য রয়েছে। হেমেন্দ্রনাথের তালিকায় দেখা যায় সুভদ্রাঙ্গী ও সঙ্ঘমিত্রার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে প্রকাশমনি ও সরোজিনী (নেড়ি)।]

আবুহোসেন বা হঠাৎ বাদশাই—কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১২৯৯ সালের ১৩ই চৈত্র মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীতে অভিনয় করেন—

আবুহোসেন—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। হারুণ-অল-রসিদ—দানুবাবু। উজীর—পদবাবু। মশুর—রাণুবাবু। ১ম বৈতালিক—অঘোরনাথ পাঠক। ২য় বৈতালিক ও খোস্‌বোওয়ালা—তিতুরাম দাস। পাগলগণ—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুমুদনাথ সরকার, পদবাবু, রাণুবাবু, ও নীলমণি ঘোষ। বিচার প্রার্থী পুরুষগণ—চুনীলাল দেব, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনুকূল-চন্দ্র বটব্যাল। হাকিম—কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী। ইমাম—কুমুদনাথ সরকার। মেওয়াওয়ালা—নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রোশেনা—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাক বিড়াল)। বেগম—বসন্তকুমারী। আবুহোসেনের মাতা—গুলফন হরি। দাই—তিনকড়ি দাসী। ১মা সখী—কুসুমকুমারী। বিচার প্রার্থিনী স্ত্রীদ্বয়—হেমন্তকুমারী ও হরিদাসী (টল)।

আলিবাবা—রঙ্গনাট্য। নাট্যকার: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ—

কাসিম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। আলিবাবা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। হুসেন—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। আবদালা—নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু। মুস্তাফা—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী। দস্যুসর্দার—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সাকিনা—ভূষণকুমারী। ফতিমা—রাণী-সুন্দরী। মর্জিনা—কুসুমকুমারী।

উলূপী—পৌরাণিক নাটক। নাট্যকার: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ষ্টার থিয়েটারে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন প্রথম অভিনীত হয়।

কলিরাজার যাত্রা—১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী (১৪ই মাঘ ১২২৮ সাল) তারিখের সমাচার দর্পনে এ বিষয়ে লেখা হয়েছিল—

নূতন যাত্রা।—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্মবেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ কেশ বিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি স্বর স্তব্ধকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটি হইতে পারে।

কাল পরিণয়—সামাজিক নাটক। নাট্যকার: রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ অরোরা থিয়েটার কর্তৃক বেঙ্গল ষ্টেজে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি—

শম্ভু—অক্ষয় চক্রবর্তী। মোক্ষদা—তারাসুন্দরী। জগদীশ—নীলমাধব চক্রবর্তী। মনীন্দ্র—প্রিয়নাথ ঘোষ। কিশোরী—হরিমতী।

নাটকের অন্তর্গত গানগুলোতে সুর দিয়েছিলেন যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের উৎসর্গপত্রে নাট্যকার লিখেছিলেন—"এই পুস্তকে দুই একটা বীভৎস চরিত্রের অবতারণা দেখিয়া চমৎকৃত হইও না। সমাজে প্রকৃতই ওই ভয়ানক পাপ প্রবেশ করিয়াছে, এবং পাপের চিত্র এবং পরিণতি, চক্ষের উপর না ধরিলে তাহাতে ঘৃণা বা আতঙ্ক আসিবে কেমন করিয়া? আর যতক্ষণ পাপে ঘৃণা ও ভয় জন্মায়, ততক্ষন তাহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে কি? কাজেই পিশাচ পিশাচীর কদাকার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিবেচনা করি নাই।"

এ নাটকের অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল—
A new socity drama entitled "Kal Parinaya" wa· put on board the stage of this popular place of amusement on Saturday night last, before a large and appreciative audience. This book is a masterpiece, and the repeated out bursts of applause from the auditorium declared the performance a signal success. [22. 3. 1902]

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী নামক গ্রন্থে লিখেছেন—[কাল পরিণয়ে] "এই মোক্ষদার ভূমিকাটি শ্রীমতী তারাসুন্দরী এতদূর সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে কলিকাতায় বিখ্যাত জমিদার ৺অনাথনাথ দেব মহাশয় তাহার এই অভিনয় দেখিয়া একখানি স্বর্ণ পদক প্রদান করিয়াছিলেন।"

কুলীনকুলসর্বস্ব—সমাজ সমস্যামূলক নাটক। নাট্যকার: রামনারায়ণ তর্করত্ন। নাটকটি রচিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। কুলীন প্রথাকে সমালোচনা করে নাটক লিখবার জন্য রংপুরের কুণ্ডীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—"বল্লাল সেনীয় কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামে এক

নবীন নাটিকা যিনি রচনা করিয়া রচকগনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" রামনারায়ণ এই মর্মে সাড়া দিয়ে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' রচনা করে পারিতোষিক পেয়েছিলেন। নাট্যকার বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন—"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল, আবহমান প্রচলিত জাতি মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোল কল্পিত কুলমর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎ প্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম।"

কলকাতায় এ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। 'এডুকেশন গেজেটে' এ অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এ অভিনয়ের উল্লেখ করে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে মার্চ মন্তব্য করেছিল—The Educational Gazette states that the well known farce of Koolino Koolo-shorbushya was acted in the great private residence of a Baboo in Calcutta with great success :

জয়রাম বসাকের বাড়ীতে অভিনয় হয়েছিল। এ সম্পর্কে অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন—"চরকডাঙ্গা রোডে (বর্তমান টেগোর ক্যাসেল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠোনে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড় বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জগদ্দুর্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের দোতলায় আমাদের Rehearsal হইত, তালিম রাজেন্দ্রবাবুই আমাদের শিক্ষা দিতেন। আমাদের এই Rehearsal প্রত্যহ হইত না, শুধু শনিবার ও বুধবার রাত্রিতে হইত। নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ কখনও তথায় আসিতেন না, একদিন মাত্র কেবল নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।...

"কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ও জগদ্দুর্লভ বাবু দিব্য ভুঁড়ি লইয়া মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত

করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের নস্যাধার। তাঁহারা দুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত। আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম।" [পুরাতন প্রসঙ্গ] **কৌতুকসর্ব্বস্ব**—১৮২৮ সনে দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়। "হাস্যার্ণব'কে দ্বিতীয় ধরিলে এটি বাংলাদেশে প্রকাশিত তৃতীয় নাটক ; ইহা গোপীনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত সংস্কৃত 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' অবলম্বনে হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক রচিত। নাটকটির আখ্যানভাগ কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। কিন্তু ইহা সংস্কৃতের যথাযথ অনুবাদ নহে ; স্থানে স্থানে বাংলা গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ দেওয়া আছে মাত্র।" [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] এখানে উল্লেখযোগ্য কুলীনকুলসর্বস্বের নাট্যকার রামনারায়ন তর্করত্নও হরিনাভি নিবাসী ছিলেন।

গ্রাম্যবিভ্রাট—প্রহসন। নাট্যকার: অমৃতলাল বসু। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। গিরিশচন্দ্রের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ [দানিবাবু] ঘোলা কামারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই ভূমিকার অভিনয় দেখিয়া নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয় দানীবাবুর প্রতি আশীর্বাদ বর্ষন করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—'গুরুদেব, আপনি কি ভুল কচ্ছেন, ওঁকে Comic part দেন না। অর্দ্ধেন্দুর পরে ওঁর মত কমিক্ পার্ট করবার লোক ষ্টেজে নেই।' [বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত] নাট্যকার অমৃতলাল বসু সম্ভবত রমানাথ স্মৃতিরত্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

জনা—পৌরাণিক নাটক। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৩০০ সালের ৯ পৌষ (ইং ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩) মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি—

নীলধ্বজ—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্যাচার্য। প্রবীর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। অগ্নি ও ভৈরব—অঘোরনাথ পাঠক। বিদূষক—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। শ্রীকৃষ্ণ—রাণুবাবু। মহাদেব ও ভীম—দাসুবাবু। অর্জুন—চুনীলাল দেব। বৃষকেতু—

কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী। অনুশাল্ব ও উলুক—অ্যাঙ্গাস (অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল) ১ম গঙ্গারক্ষক—পদবাবু। ২য় গঙ্গারক্ষক—গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাম—হরিদাসী (টল)। মন্ত্রী—নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সেনাপতি ও পাণ্ডবদূত—নীলমণি ঘোষ। সেনানায়ক—বিজয়কৃষ্ণ বসু। প্রবীরের দূত—মাণিকলাল ভট্টাচার্য। জনা—তিনকড়ি দাসী। স্বাহা ও রতি—শরৎকুমারী। মদনমঞ্জরী—ভূষনকুমারী। বসন্তকুমারী—কুসুমকুমারী। নায়িকা—ভবতারিণী। ব্রাহ্মণী ও গঙ্গা - হরিমতী (গুলফন)।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন অর্জুনের ভূমিকায় কুমুদ সরকার অভিনয় করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কয়েক রাত্রি অভিনয় করে অর্ধেন্দুশেখর এমারেল্ড থিয়েটারে চলে গেলে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

জামাই বারিক—প্রহসন। নাট্যকার: দীনবন্ধু মিত্র। রচনাকাল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম অভিনয় ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর। এই হিসেবে এটি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক। প্রথম নাটক, বলা বাহুল্য, দীনবন্ধুর নীলদর্পন। পদ্মলোচন সেজেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। এই অভিনয় সম্পর্কে অমৃতলাল বসু স্মৃতিকথায় বলেছেন—"কেবলমাত্র নীলদর্পন নাটকখানি লইয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। শুধু একখানা নাটক কতদিন লোকের ভাল লাগিতে পারে? নীলদর্পন দুই রাত্রি অভিনীত হইবার পরই আমরা জামাই বারিকের রিহার্সাল আরম্ভ করিয়া দিলাম।" [পুরাতন প্রসঙ্গ] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য লিখেছেন "নীলদর্পন নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল কর্তৃক 'জামাই বারিক' অভিনীত।" [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস]

তরুবালা—সামাজিক নাটক। নাট্যকার: অমৃতলাল বসু। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ভূমিকালিপি—

ঠাকুরদা—নীলমাধব চক্রবর্তী। ঠানদিদি—গঙ্গামনি। তরুবালা—প্রমদা।

অখিল—অমৃতলাল মিত্র। বেহারী খুড়ো—অমৃতলাল বসু। শান্তা—নগেন্দ্র। পারুল—মানদা। হীরালাল—অক্ষয় কোঁয়র।

ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তরুবালা প্রযোজনার প্রশংসা করা হয়েছিল।

তাজ্জব ব্যাপার—প্রহসন। নাট্যকার : অমৃতলাল বসু। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

তুফানী—প্রহসন। নাট্যকার : অতুলকৃষ্ণ মিত্র। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন—

তুফানি—অহীন্দ্রনাথ দে। জাফর—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। দেবকণ্ঠ বাগচী সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন।

দলিতা ফণিনী—রোমান্টিক নাটক। নাট্যকার : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩০শে নভেম্বর ১৯০৭ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ভূমিকালিপি—

বিশ্বনাথ রাও—তারকনাথ পালিত। নরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। সোরাবজী—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী। মোহন—নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু। রমাবাই—কুসুম কুমারী। বিলাসবতী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি)। মোহিনী—তিনকড়ি (ছোট)।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন রমাবাই ও বিলাসবতী যথাক্রমে নগেন্দ্র বালা ও কুসুম কুমারী অভিনয় করেছিলেন। [ভারতীয় নাট্য মঞ্চ ১ম খণ্ড]

দুর্গাদাস—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রথম অভিনয় হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। ভূমিকালিপি—

দুর্গাদাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। রাজিয়া—সুশীলা। দিলীর—তারকনাথ পালিত। মহামায়া—প্রকাশ। তাঁহাবর—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। আকবর—ক্ষেত্র মোহন মিত্র। ঔরঙ্গজেব—প্রিয়নাথ ঘোষ।

নন্দকুমার—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার : ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ২৮ আগষ্ট ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ভূমিকালিপি—

নন্দকুমার—নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাপুদেব শাস্ত্রী—মহেন্দ্র চৌধুরী। হেষ্টিংস—অক্ষয় কোঁয়র। প্রমদা—বসন্তকুমারী। দস্যু সর্দার—ননী দত্ত। রাধিকা—তারাসুন্দরী।

নরমেধ যজ্ঞ—পৌরানিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক। নাট্যকার: রাজকৃষ্ণ রায়। নরমেধ যজ্ঞ "ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক"—রূপে উল্লিখিত হয়েছিল। প্রথম অভিনয় ষ্টার থিয়েটারে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন—

সিদ্ধার্থ—অমৃতলাল মিত্র। মহানন্দ—অমৃতলাল বসু। যযাতি—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। মনি দত্ত—তারা সুন্দরী। কাত্যায়নি—গঙ্গামনি। কুশ—নলিনী।

'নরমেধ যজ্ঞ' নামে আরেকটি নাটক পাওয়া যায়, লেখকের নাম নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এটির অভিনয় হয়েছিল কিনা জানা যায় না। 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের লেখক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ও 'নরমেধ যজ্ঞ' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারী।

নীলদর্পন—দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশকালে নাট্যকারের নাম ছিল না। বাঙলা রঙ্গ মঞ্চের ইতিহাসে 'নীলদর্পন' ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নীলদর্পন নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক নীলদর্পন অভিনীত হয়। বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হিসেবে ঘটনাটি চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য নীলদর্পনের অভিনয় নাকি এটিই প্রথম নয়। এর আগে ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় ১৮৬০—৬১ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। যাই হোক, ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত প্রথম অভিনয়ের ভুমিকালিপি দেওয়া হল—

গোলক বসু, উড সাহেব, জনৈক রাইয়ত ও সাবিত্রী—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। নবীন মাধব—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিন্দু মাধব—কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোরাপ, রাইচরণ, গোপ ও নীলকরদিগের মোক্তার—মতিলাল সুর। সাধুচরণ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পদী ময়রানী—মহেন্দ্রলাল বসু। সৈরিন্ধ্রি—অমৃতলাল বসু। রোগ সাহেব—অবিনাশ কর। গোপী দেওয়ান—শিব চট্টোপাধ্যায়। মোক্তার ও আদুরী—গোপাল দাস। কবিরাজ—শশী দাস। সরলতা—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী। রেবতী—তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। লাঠিয়াল—পূর্ণ মিত্র। রাখাল—যদু ভট্টাচার্য। খালাসী—গোলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যোগদান করেন নি। বরং বেনামে এ অভিনয়ের নিন্দা করে সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন এবং একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন।

নুরজাহান—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ভূমিকালিপি—

নুরজাহান—প্রকাশ। লয়লা—সুধীরা। যোধাবাই—হেমন্তকুমারী। জাহাঙ্গীর—প্রিয়নাথ ঘোষ।

পদ্মিনী—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। প্রথম অভিনয় ষ্টার থিয়েটারে। তারিখ ২৩শে ডিসেম্বর ১৯০৫। ভূমিকালিপি—

পদ্মিনী—বসন্তকুমারী। আলাউদ্দীন—মহেন্দ্র চৌধুরী। লক্ষ্মণসিংহ—অমৃতলাল মিত্র। ভীমসিংহ—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। নসীবন—নরীসুন্দরী। নসীবনের পিতা—অক্ষয় কোঁয়র। হামিরের মা—সরযূবালা।

পয়জারে পাজী—প্রহসন। নাট্যকার : দুর্গাদাস দে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে যে কোন এক সময়ে সিটি থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।

পাণ্ডব নির্বাসন—পৌরাণিক নাটক। নাট্যকার : কেদার চৌধুরী। প্রথম অভিনয় ৮ই অক্টোবর, ১৮৮৭। ভূমিকালিপি—

দ্রৌপদী—ভুনী (বনবিহারিণী)। দুর্যোধন—মহেন্দ্রনাথ বসু। ধৃতরাষ্ট্র—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। শকুনি—রাধামাধব কর। যুধিষ্ঠির—মতিলাল সুর। ভীম—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়। ভানুমতী—কিরণশশী (ছোটরাণী)।

"সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী জহরলাল ধর এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে সম্পাদিত উৎকৃষ্ট দৃশ্যপট এবং বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত হইয়া দর্শক-মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।"

[গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারী 'পাণ্ডব নির্বাসন' নামে আরেকটি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি লিখেছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ণচন্দ্র—ভগবদ্ বিশ্বাসমূলক নাটক। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম অভিনয়: ১৭ মার্চ, ১৮৮৮। স্থান: এমারেল্ড থিয়েটার। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—

শালিবাহন—মহেন্দ্রলাল বসু। পূর্ণচন্দ্র—গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত)। দামোদর—মতিলাল সুর। সেবাদাস—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য। জম্বু (চামার)—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গোরক্ষনাথ—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু)। ইচ্ছা—ক্ষেত্রমণি। লুনা—বনবিহারিনী! শারী—কুসুমকুমারী। সুন্দরা—কিরণশশী (ছোট রাণী)।

নাটকটির সঙ্গীতাচার্য ছিলেন শশিভূষণ কর্মকার এবং রঙ্গভূমি সজ্জাকর ছিলেন ধর্মদাস সুর ও শশিভূষণ দে।

"অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী গোপাললাল বাবুর উক্তি ও তাঁহার স্বাক্ষরিত একটি কবিতা মহেন্দ্রলাল বসু কর্তৃক পঠিত হয়। কবিতাটি গিরিশচন্দ্রের রচিত।" [গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]।

প্রতাপাদিত্য—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ। নাটকটির পুরো নাম। বঙ্গের প্রতাপাদিত্য। প্রথম অভিনয়: ১৫ই আগষ্ট, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ। স্থান: স্টার থিয়েটার। ভূমিকালিপি—

প্রতাপাদিত্য—অমৃতলাল মিত্র। বিক্রমাদিত্য ও রডা—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। বিজয়া—নরীসুন্দরী। বসন্ত রায়—অক্ষয় কোঁয়র। গোবিন্দদাস—

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। আকবর—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। সেলিম—ননীলাল দত্ত। চণ্ডীবর—নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল—সামাজিক নাটক। নাট্যকার : গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ—

যোগেশ—অমৃতলাল মিত্র। রমেশ—অমৃতলাল বসু। সুরেশ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। যাদব—তারাসুন্দরী। পীতাম্বর—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। কাঙালী চরণ—শ্যামাচরণ কুণ্ডু। শিবনাথ—রাণুবাবু। মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী—নীলমাধব চক্রবর্তী। ভজহরি—বেলবাবু। অনাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট—রামতারণ সান্যাল। ব্যাঙ্কের দারোয়ান ও জমাদার—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। ইনস্পেকটার প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ইন্‌টারপ্রেটার ও জেল ডাক্তার—বিনোদ বিহারী সোম (পদবাবু)। ২য় ব্যাপারী ও টারন্‌কি—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী। শুঁড়ি—শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার—নীলমণি ঘোষ। জনৈক লোক—অঘোরনাথ পাঠক। উমাসুন্দরী—গঙ্গামণি। জ্ঞানদা—কিরণবালা। প্রফুল্ল—ভূষণকুমারী। জগমণি—টুন্নামণি। বাড়ীওয়ালী—জগত্তারিনী। ইতর স্ত্রীলোক (মাতালনী)—বনবিহারিনী। ঘোমটাওয়ালীদ্বয়—প্রমদাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।

"এই নাটকের সমালোচনা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ধারাবাহিক তিন দিবস বাহির হয়। এরূপ সমালোচনা দেশীয় কোনও পুস্তকের এতাবৎ ঘটে নাই।" [গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

প্রমোদরঞ্জন—গীতিনাট্য। নাট্যকার : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। প্রথম অভিনয় রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার। তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। চঞ্চলকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

ফুলশয্যা—বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য। নাট্যকার : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। প্রথম অভিনয় হয়েছিল এমারেল্ড থিয়েটারে ৩১ শে আগষ্ট, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এমারেল্ড থিয়েটার লীজ নিয়ে কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করেন। 'ফুলশয্যা' তাদের মধ্যে একটি।

বলিদান—সামাজিক নাটক। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম অভিনয়: ২৬ শে চৈত্র, ১৩১১ সাল (ইং ৮ই এপ্রিল ১৯০৫)। স্থান: মিনার্ভা থিয়েটার। প্রথম রজনীর ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী অভিনেতৃবর্গ—

করুণাময়—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। রূপচাঁদ—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। দুলালচাঁদ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। মোহিতমোহন—ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ঘনশ্যাম—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)। কিশোর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কালী ঘটক—জীবনকৃষ্ণ পাল। রমানাথ—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। নলিন—ধীরেন্দ্রনাথ। মুকুন্দলাল—অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ইনস্পেক্টার—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। উকীল—জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়। সরস্বতী—তারাসুন্দরী। যশোমতী—সরোজিনী। রাজলক্ষ্মী—নগেন্দ্রবালা। জোবি—সুশীলাবালা। মাতঙ্গিনী—সুধীরাবালা (পটল)। কিরণ্ময়ী—কিরণবালা। হিরণ্ময়ী—চারুবালা। জ্যোতির্ময়ী—মনোরমা। ভামিনী—পান্নাসুন্দরী। করুণাময়ের ঝি—চপলা-সুন্দরী।

এ ছাড়া এ নাটকের অন্যান্য দায়িত্ব পড়েছিল এভাবে—

শিক্ষক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (সহকারী)। রঙ্গভূমি-সজ্জাকর—শ্যামাচরণ কুণ্ড। সুর সংযোজনা—রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন মুকুন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন হরিদাস দত্ত এবং নিভাননীর ভূমিকা নিয়েছিলেন কিরণবালা। জ্যোর্তিময়ী সেজেছিলেন মনোরমা।

বিবাহ বিভ্রাট—প্রহসন। নাট্যকার: অমৃতলাল বসু। প্রথম অভিনয় হয়েছিল ২২শে নভেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। স্থান: ষ্টার থিয়েটার। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—

মিঃ সিং—অমৃতলাল বসু। মিসেস বিলাসিনী কারফরমা—বিনোদিনী। ঝি—ক্ষেত্রমণি। কর্তা—নীলমাধব চক্রবর্তী। নন্দ—অঘোরনাথ পাঠক।

বিমাতা—পারিবারিক নাটক। নাট্যকার: অমৃতলাল বসু। নাটকটির

পুরো নাম 'বিমাতা বা বিজয় বসন্ত'। প্রথম অভিনয় হয়েছিল ষ্টার থিয়েটারে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট। প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—

রাজা—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। বলবন্ত—অমৃতলাল মিত্র। বিজয়—তারাসুন্দরী। বটুকচাঁদ—রাধামাধব কর। দুর্জয়মণি—নগেন্দ্রবালা। শান্তা—গঙ্গামণি। শ্যামা—অক্ষয়কালী কোঁয়র।

বিয়ে পাগলা বুড়ো—প্রহসন। নাট্যকার: দীনবন্ধু মিত্র। প্রথম অভিনয় হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে—১৮৭৩ সনের ১৫ই জানুয়ারী বুধবার। এর আগে ন্যাশনাল থিয়েটারে শুধু মাত্র শনিবার অভিনয় হত। বুধবারেও অভিনয় করা স্থির হলে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম অভিনীত হয়েছিল। এ অভিনয় সম্পর্কে 'মধ্যস্থ' পত্রিকা (৬ই মাঘ, ১২৭৯ সাল) লিখেছিল—

"সর্বাগ্রে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হইল। প্রথমে নট, পরে রতা, কেশব, ভুবন প্রভৃতির পালা। তাঁহাদিগের অভিনয় সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল, কেবল মাঝে মাঝে একটু আধটু দোষ ছিল।...

"রাজিবের অভিনয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাজিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্রের এ নামের বিখ্যাত গ্রন্থের নাট্যরূপ কেমন হয়েছিল জানা যায় না। নাটকটি কখনও প্রকাশিত হয় নি। এটি অভিনীত হয়েছিল শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে ৬ই অক্টোবর, ১৮৩৫। বর্তমান শ্যামবাজার ট্রামডিপোর স্থানে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ী ছিল। এ অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ২২শে অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পায়োনিয়ার' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রে [দ্রঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস]। বিদ্যার চরিত্রে রাধামণি বা মণি এবং রাণী ও মালিনীর ভূমিকায় জয়দুর্গা নামক জনৈক প্রৌঢ় রমণীর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল। এ নাট্যাভিনয়টিকে বাঙ্গালীর

প্রচেষ্টায় প্রথম বাঙলা নাটক অভিনয় বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর এই নাট্যপ্রচেষ্টায় মহিলাগণই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সে যুগের পক্ষে এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার।

ভদ্রার্জুন—অর্থাৎ অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ। নাট্যকার: তারাচরণ শিকদার। প্রথম মুদ্রিত বাঙলা নাটক। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছিলেন—

"বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎ সম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীতে দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনেই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।" নাটকটি কখনো অভিনীত হয় নি।

ভানুমতী চিত্তবিলাস—শেকসপীয়রের Merchant of Venice নামক নাটকের মর্মানুবাদ। গদ্য ও পদ্যে রচিত। নাট্যকার: হরচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশকাল ১৮৫৩ সন। নাটকটি অভিনয়যোগ্য ছিল না। কখনো অভিনীত হয়ও নি।

ভ্রমর—সামাজিক নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন 'বারুণী পুকুর ও পোষ্টাপিস প্রভৃতি দৃশ্য গিরিশ কর্তৃক সংযোজিত।' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৯ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর। প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি—

কৃষ্ণকান্ত—মহেন্দ্রনাথ বসু। হরলাল—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। গোবিন্দলাল—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। মাধবীনাথ—চণ্ডীচরণ দে। নিশাকর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। ব্রহ্মানন্দ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। হরে—নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু। সোনা—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। রূপো ও বিধা—অহীন্দ্রনাথ দে। স্বপ্না—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী। ভ্রমর—কুসুমকুমারী। রোহিনী—প্রমদাসুন্দরী। যামিনী—রী।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন যামিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ভূষণকুমারী। সমকালীন পত্রপত্রিকায় অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারীর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা হয়েছিল।

মীরকাসিম—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৯০৬ সনের ১৬ই জুন নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—

মীরজাফর—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মীরকাসিম—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। সুজাউদ্দৌলা ও লাল সিং—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)। সাহ্ আলম ও আমিয়ট—Lt. Banyin (Amateur)। আলী ইব্রাহিম—তারকনাথ পালিত। সামসেরউদ্দীন ও ডাক্তার ফুলারটন—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। তকী খাঁ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। মহম্মদ আমীন—উপেন্দ্রনাথ বসাক। হায়বতুল্লা ও আয়াব আলী—জীবনকৃষ্ণ পাল। ফৌজদার-দূত—ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ ও সমরু—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য। জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ—সুটবিহারী মিত্র। রায়দুর্লভ কৃষ্ণচন্দ্র ও সলিমান—জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়। রাজবল্লভ ও মহম্মদ ইশাখ—পান্নালাল সরকার। রামনারায়ণ ও আলম খাঁ—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নন্দকুমার—সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। ভ্যান্সিটার্ট—অটলবিহারী দাস। হলওয়েল, হে ও মেজর অ্যাডাম্স্—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। হেষ্টিংস—প্রকাশমণি। ইলিস, ব্যাটসন্ ও মনরো—ক্ষেত্রমোহন মিত্র। মাঝি—মন্মথনাথ বসু। কেল্ড ও জোন্স—ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। জন কার্ণাক—

সত্যেন্দ্রনাথ দে। গুরগিণ খাঁ—খগেন্দ্রনাথ সরকার। খোজা পিক্রু—হরিদাস দত্ত। বাজিদ ও জাফর খাঁ—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মণি বেগম—সুধীরা বালা (পটল)। বেগম—সুশীলা বালা। তারা—তিনকড়ি দাসী।

নাট্যশিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন তারাপদ রায়।

মুই হ্যাঁদু—পঞ্চরং। নাট্যকার : বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯৩ সনের ২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হয়েছিল। বড়দিনের পঞ্চরং হিসেবে এটি দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল। পঞ্চরংটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুকুমারী দত্ত। 'মুই হ্যাঁদু' সম্পর্কে অনুসন্ধান পত্রিকায় (২৭শে জানুয়ারী ১৮৯৪) লেখা হয়েছিল—

"মুই হ্যাঁদু' ভণ্ড হিন্দুঁয়ানীর পঞ্চ-চিত্র-সামাজিক-সঙের প্রতিচ্ছায়া! মুখে হিঁদুয়ানী হিঁদুয়ানী করেন, কিন্তু কাজের বেলায় ম্লেচ্ছের বেহদ্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—সমাজ সঙের এমনই কারখানা। রঙ্গভূমি 'মুই হ্যাঁদু' পঞ্চরং-এ এই কারখানাই দেখাইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ঘৃণা হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে ক্রোধ হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে মুখে চুনকালী দিতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

ম্যাকবেথ—শেকসপীয়রের লেখা Macbeth নাটকের অনুবাদ। অনুবাদক-গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি—

ডনক্যান—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য। ম্যাকম—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। ডনালবেন—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। ম্যাকবেথ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ব্যাঙ্কো—কুমুদনাথ সরকার। ম্যাকডফ ও হিকেট—অঘোরনাথ পাঠক। লেনক্স—বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)। রস্—কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী। মেনটিয়েথ, ৩য় হত্যাকারী ও ৩য়া ডাকিনী—নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অ্যাঙ্গাস—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল। কেথনেস, ২য় হত্যাকারী ও রক্তাক্ত সৈনিক—চুনীলাল দেব। ফ্লিয়েন্স—কুসুমকুমারী। বৃদ্ধ সিউয়ার্ড—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু)।

যুবা সিউয়ার্ড ও ২য়া ডাকিনী—নীলমণি ঘোষ। সিটন—নন্দহরি ভট্টাচার্য। দ্বারপাল, ১ম ডাকিনী, বৃদ্ধ, ১ম হত্যাকারী ও ডাক্তার—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। দূতদ্বয়—মানিকলাল ভট্টাচার্য ও তিতুরাম দাস। ম্যাকডফের পুত্র—চয়নকুমারী। লেডী ম্যাকবেথ—তিনকড়ি দাসী। লেডী ম্যাকডফ—প্রমদাসুন্দরী। পরিচারিকা—হরিমতী (ডেকদি)।

সঙ্গীত শিক্ষক—দেবকণ্ঠ বাগচী। রঙ্গভূমি সজ্জাকর—ধর্মদাস সুর।

রাজবাহাদুর—প্রহসন। নাট্যকার: অমৃতলাল বসু। প্রথম অভিনয়: ষ্টার থিয়েটার—২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯১। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ—

রাজাবাহাদুর—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। মিঃ ফিস—অমৃতলাল বসু।

রাজসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমৃতলাল বসু। প্রথম অভিনয়: ষ্টার থিয়েটার—১১ই জানুয়ারী ১৮৯৬ সন। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ:—

রাজসিংহ—অমৃতলাল মিত্র। দরিয়া—নরীসুন্দরী। ঔরঙ্গজেব সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ফট্যাই)। মোবারক—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। জেবউন্নেসা—গঙ্গামনি। মাণিকলাল—অক্ষয়কালী কোঁয়র। চঞ্চলকুমারী—প্রমদাসুন্দরী।

রাণা প্রতাপ—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রথম অভিনয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই। স্থান: ষ্টার থিয়েটার। প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—

প্রতাপ সিংহ—অমৃতলাল মিত্র। শক্তসিংহ—অমৃতলাল বসু। মানসিংহ—অক্ষয়কালী কোঁয়র। পৃথ্বীরাজ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। মেহেরুন্নিসা—নরীসুন্দরী। দৌলত—বসন্তকুমারী।

রিজিয়া—বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য। নাট্যকার: মনোমোহন রায়। প্রথম অভিনয় ১৭ই মে, ১৯০২ সন। 'অরোরা থিয়েটার' বেঙ্গল ষ্টেজে অভিনয় করেছিলেন। প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি:—

রিজিয়া—তারাসুন্দরী। ঘাতক—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। বক্তিয়ার—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ইন্দিরা—হরিমতি।

রুক্মিনী রঙ্গ—প্রহসন। চৈতন্ত লাইব্রেরীতে এ প্রহসনটির যে copy রয়েছে তাতে টাইটেল পৃষ্ঠা না থাকায় নাট্যকারের নাম জানা যায় নি। শিশির বসু তাঁর একশ বছরের বাংলা থিয়েটার গ্রন্থে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত যে নাট্য তালিকা দিয়েছেন তাতে প্রহসনটির লেখক হিসেবে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পুস্তকের অন্তর্গত বিহারীলাল রচিত নাট্যতালিকায় রুক্মিনীরঙ্গ নেই। দেবকুমার বসুর সম্পাদিত 'বাংলা নাটক' গ্রন্থে প্রহসনটির লেখক হিসেবে রাখাল দাস ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। প্রহসনটিতে একটি অঙ্ক ও সাতটি দৃশ্য আছে। প্রথম অভিনয় হয়েছিল বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৭ সনের ৩০শে মে।

লালা গোলকচাঁদ—নাট্যকার: সুরেন্দ্রনাথ বসু। প্রথম অভিনয় হয়েছিল এমারেল্ড থিয়েটারে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর। প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন :—

লালা—মহেন্দ্রনাথ বসু। মাতাজী—বিষাদ কুসুম।

লীলাবতী—নাট্যকার: দীনবন্ধু মিত্র। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে লীলাবতী প্রথম অভিনীত হয়েছিল শ্যামবাজার রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে ১৮৭১ সনের মে মাসে। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন :—

ললিত—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। হরবিলাস ও ঝি—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। নদের চাঁদ—যোগেন্দ্র মিত্র। হেমচাঁদ—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেজোখুড়ো মতিলাল সুর। সারদাসুন্দরী—বেলবাবু। ভোলানাথ চৌধুরী—মহেন্দ্র বসু। লীলাবতী—সুরেশ মিত্র। রাজলক্ষ্মী—ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীনাথ—শিব চ্যাটার্জি। ক্ষীরোদ বাসিনী—রাধামাধব কর। রঘু উড়ে—হিঙ্গল খাঁ। যোগজীবন—যদু ভট্টাচার্য।

শাহজাদী—নাট্যকার: অতুলকৃষ্ণ মিত্র। প্রথম অভিনয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন।

শিরি ফরহাদ—গীতিনাট্য। নাট্যকার: অতুলকৃষ্ণ মিত্র। ১৩১৩ সাল,

২৪শে ভাদ্র, রবিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন :—

শিরি—নগেন্দ্র বালা। ফরহাদ—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। গুলাল—সুশীলা। হামজাদ—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

'শিরিফরহাদ' নামে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটি নাটক ভারতী (১৩১৩ সাল) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সধবার একাদশী—প্রহসন। নাট্যকার : দীনবন্ধু মিত্র। প্রথম অভিনীত হয়েছিল বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তমী পূজোর দিন। চতুর্থ অভিনয় হয় শ্রীপঞ্চমীতে রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন : নিমচাঁদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অটল—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনচন্দ্র—অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী। রামমাণিক্য—রাধামাধব কর। কাঞ্চন—নন্দলাল ঘোষ।

সতী কি কলঙ্কিনী—নাট্যরাসক। নাটকটির পুরো নাম 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক ভঞ্জন।' নাট্যকার : নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় : ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর। স্থান : গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন :—

রাধিকা—রাজকুমারী। বৃন্দা—ক্ষেত্রমণি। সখি—যাদুমনি। জটিলা কুটিলা—কাদম্বিনী ও হরিদাসী। কৃষ্ণ—মদন বর্মন। নৃত্যশিক্ষক ছিলেন কান্তাপ্রসাদ।

সরলা—সামাজিক নাটক। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নামক উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমৃতলাল বসু। প্রথম অভিনীত হয়েছিল ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ—

সরলা—কিরণবালা। শ্যামা—গঙ্গামণি। প্রমদা—কাদম্বিনী। শশীভূষণ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। বিধুভূষণ—অমৃতলাল মিত্র। গদাধর—বেলবাবু। নীল-কমল—পরাণ শীল।

সাবিত্রী—পৌরানিক নাটক। নাট্যকার: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। প্রথম অভিনয়: ষ্টার থিয়েটার। তারিখ: ৪ঠা অক্টোবর, ১৯০২। মাণ্ডব্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমৃতলাল মিত্র।

সিরাজদ্দৌলা—ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম অভিনয়: মিনার্ভা থিয়েটার। তারিখ: ২৪ ভাদ্র, ১৩১২ সাল (ইংরেজী ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ খৃঃ)। প্রথম অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারী অভিনেতৃবর্গ—

সিরাজদ্দৌলা—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। মীরজাফর—নীলমাধব চক্রবর্তী। মীরণ—হুটবিহারী মিত্র। সওকতজঙ্গ, ক্লাফটন ও মুঁসালা—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। রাজবল্লভ ও লছমন সিং—জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়। রায়দুর্লভ ও মীরকাসিম—কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়। মোহনলাল—তারকনাথ পালিত। জগৎ শেঠ মহাতাবচাঁদ ও আমিরবেগ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। জগৎ শেঠ, স্বরূপচাঁদ ও মীর দাউদ—সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। মানিকচাঁদ ও রাসবিহারী—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মীরমদন ও মহম্মদীবেগ—মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)। উমিচাঁদ—হরিদাস দত্ত। করিম চাচা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। দানসা—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। ক্লাইভ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ড্রেক ও কুট—উপেন্দ্রনাথ বসাক। হলওয়েল ও ওয়াটস্—অটলবিহারী দাস। চেম্বর্স ও সিনফ্রে—ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ওয়ালস ও কিলপ্যাট্রিক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। আলিবর্দীবেগম ও জহরা—তারাসুন্দরী। ঘসেটীবেগম ও ওয়াটস পত্নী—সুধীরাবালা (পটল)। আমিনা বেগম ও জোবেদী—ভূষণ কুমারী (ছোট)। লুৎফউন্নিসা—সুশীলাবালা। উন্মৎ জহুরা—সুবাসিনী।

নাটকটির সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন শশিভূষণ বিশ্বাস ও তারাপদ রায়। নৃত্য-শিক্ষক ও রঙ্গভূমি সজ্জাকর ছিলেন যথাক্রমে সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ও কালীচরণ দাস।

হরিরাজ—ঐতিহাসিক ঘটনামূলক বিয়োগান্ত নাটক। নাট্যকার: নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। শেকস্‌পীয়রের Hamlet অনুসরণে লেখা। প্রথম অভিনয়

হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে জুন। স্থান: ক্লাসিক থিয়েটার। প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—

হরিরাজ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। জয়াকর—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। কহ্লন—প্রমথনাথ দাস। কুলধ্বজ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী। দধিমুখ—ভোলানাথ দাস। শ্রীলেখা—ছোট রানী। অরুণা—তারাসুন্দরী। সুরমা—ক্ষুদিবালা। মলিনা—সরোজিনী। সুর দিয়েছিলেন পূর্ণ ঘোষ।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন জয়াকর সেজেছিলেন মণ্টুবাবু। কিন্তু রমাপতি দত্ত লিখেছেন "প্রথম অভিনয় রজনীর পরিচয় লিপিতে দেখি যে, হরিভূষণ ভট্টাচার্য জয়াকরের অংশে অবতীর্ণ হন।" (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ পৃ: ১৫১)

হারানিধি—সামাজিক নাটক। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম অভিনয়: ষ্টার থিয়েটার, তারিখ : ২৪ ভাদ্র, ১২৯৬ সাল (ইং ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯)। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—

মোহিনীমোহন—উপেন্দ্রনাথ মিত্র। হরিশ—অমৃতলাল মিত্র। নীলমাধব—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোর—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। নব—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। গুণনিধি—প্রিয়লাল মিত্র। ধরনীধর—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। তেজবাহাদুর—রাণুবাবু। ভৈরব—নীলমাধব চক্রবর্তী। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র—পরাণকৃষ্ণ শীল। ধনীরাম—শ্যামাচরণ কুণ্ডু। সোনাউল্লা—উমেশচন্দ্র দাস। হৈমবতী—জগত্তারিনী। সুশীলা—নগেন্দ্রবালা। কমলা—কিরণবালা। হেমাঙ্গিনী—তারাসুন্দরী। কাদম্বিনী—গঙ্গামনি।

প্রসঙ্গ : নাট্যশালা

অরোরা থিয়েটার : গুরুপ্রসাদ মিত্র বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চ লিজ নিয়ে অরোরা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। থিয়েটারটি অবশ্য বেশিদিন চলে নি। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাস থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় আঠাশখানি নাটক অরোরা থিয়েটার মঞ্চস্থ করেছিল। বিভিন্ন সময়ে এ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নীলমাধব চক্রবর্তী, কুসুমকুমারী, গোলাপসুন্দরী, তারাসুন্দরী প্রভৃতি বিখ্যাত নটনটীগণ।

ইউনিক থিয়েটার : অরোরা থিয়েটার লুপ্ত হলে বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ লিজ নিয়ে ইউনিক থিয়েটারের পত্তন হল। এই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন গিরিমোহন মল্লিক। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ধনী গোপাললাল শীলের ভাগনে। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুর যথাক্রমে ম্যানেজার ও ষ্টেজ ম্যানেজার হয়েছিলেন। অবশ্য এ থিয়েটারও বেশিদিন চলে নি। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় আঠারোখানি নাটক ইউনিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে এতে যুক্ত ছিলেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র, চুনিলাল দেব, তারকনাথ পালিত, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), তারাসুন্দরী, সুধীরাবালা, সুশীলাবালা প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গ।

এমারেল্ড থিয়েটার : বিখ্যাত ধনী গোপাললাল শীল এমারেল্ড থিয়েটার খুলেছিলেন। বিডন ষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের বাড়ী কিনে এ থিয়েটারের পত্তন তিনি করেছিলেন। ম্যানেজার হয়েছিলেন কেদার চৌধুরী। এ থিয়েটার প্রায় আটবছর টিকেছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ মঞ্চে প্রায় ছত্রিশটি নাটক প্রযোজিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে এ মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, চুনিলাল দেব, মতিলাল সুর। রাধামাধব কর। হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কিরণশশী, ক্ষেত্রমণি, ভবতারিণী, সুকুমারী (গোলাপ), হরি (গুলফম) প্রভৃতি নটনটীগণ।

কোহিনুর থিয়েটার: শরৎচন্দ্র রায় নিলামে ক্লাসিক থিয়েটার কিনে নিয়ে কোহিনুর থিয়েটার স্থাপন করেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের জমিদার প্রসন্নকুমার রায়ের পুত্র। মিনার্ভার মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁর থিয়েটারের মালিক হবার বাসনা জেগেছিল। প্রথমে অমৃতলালবাবুকে এ থিয়েটারের নাট্যাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যোগদানে সক্ষম হলেন না। ধর্মদাস সুর ষ্টেজ ম্যানেজার এবং গিরিশচন্দ্র হলেন ম্যানেজার। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের চাঁদবিবি দিয়ে কোহিনুরের উদ্বোধন হল। স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র রায় অবশ্য বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। সে বছরের শেষদিনে তিনি মারা গেলেন। তাঁর ভাই শিশিরকুমার থিয়েটারের রিসিভার হলেন। অতঃপর নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে কোহিনুর প্রায় পাঁচ বছর চলেছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলিন' এ থিয়েটারের শেষ অভিনয়। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে কোহিনুর কিনে নিয়েছিলেন। প্রায় সাইত্রিশটি নাটক এ থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে এতে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চুনিলাল দেব, তারকনাথ পালিত, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি দাসী, প্রমদাসুন্দরী, লীলাবতী প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গ।

ক্লাসিক থিয়েটার: অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও গিরিশচন্দ্রের নলদময়ন্তী দিয়ে ক্লাসিক থিয়েটার যাত্রা শুরু করেছিল কিন্তু তার যথার্থ জনপ্রিয়তা শুরু হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' প্রযোজনার মাধ্যমে। অতঃপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্লাসিক থিয়েটার চলেছিল। এ সময় সীমার মধ্যে প্রায় আঠাশখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেছেন অঘোরনাথ পাঠক, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চুনিলাল দেব, নীলমাধব চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র

বসু, মনোমোহন গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), কুসুমকুমারী, গোলাপ-সুন্দরী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি দাসী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি) প্রভৃতি আরও অনেকে।

গেইটি থিয়েটার: অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তী ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করে বীণা রঙ্গমঞ্চে সিটি থিয়েটার চালাতে থাকেন। বছর পাঁচেক পর সিটি থিয়েটার উঠে গেলে বীণা রঙ্গমঞ্চে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গেইটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য গেইটি থিয়েটার অল্পদিন স্থায়ী হয়েছিল। সম্ভবত সেই বছরের গেইটির বিলুপ্তি ঘটে। স্বল্পস্থায়ী এই থিয়েটারে মকরে নিতাই, প্রলয়ঙ্করী, নৈরাকার প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। ষ্টারে তখন 'স্ত্রীবুদ্ধি' নামে একটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। প্রলয়ঙ্করী নাটকটি তারই অনুসরণে লেখা।

গ্র্যাণ্ড থিয়েটার: ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে এসে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খুলেছিলেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চুনিলাল দেব। ৬ই মে মনোমোহন গোস্বামীর পৃথ্বীরাজ নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে গ্র্যাণ্ড থিয়েটার যাত্রা শুরু করেছিল। অবশ্য এ থিয়েটার বেশিদিন চলে নি। ঐ বছরই ২ শে অক্টোবর 'প্রতিফল' অভিনয়ের পর গ্র্যাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। গোটা পাঁচেক নাটক গ্র্যাণ্ড থিয়েটার মঞ্চস্থ করেছিল।

ন্যাশনাল থিয়েটার: ন্যাশনাল থিয়েটারের মাধ্যমেই বাঙলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোয় সান্যাল বাড়ীতে নীলদর্পন নাট্যাভিনয় দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার যাত্রা শুরু করে। এ অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি নাট্যজগতের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ। গিরিশচন্দ্র এ অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ন্যাশনালে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণকুমারী প্রযোজনার সময়। তিনি ভীমসিংহ সেজেছিলেন। অতঃপর ন্যাশনাল থিয়েটার গ্রেট ন্যাশানাল, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল প্রভৃতি নামের মাধ্যমে দীর্ঘদিন টিঁকে ছিল। অবশ্য বিভিন্ন দল বিভিন্ন

সময়ে এ ধরনের নাম নিয়ে নাট্য প্রযোজনা করেছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেও দেখা যাচ্ছে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল নামে একটি সম্প্রদায় অভিনয় করছে; ৩০শে জুলাই সুরেন্দ্র বসুর 'লালা গোলোকচাঁদ' অভিনীত হচ্ছে।

পারসী থিয়েটার: কলকাতায় পারসী থিয়েটারের ইতিহাস কৌতুহলোদ্দীপক। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পারসী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রায় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বহু নাটক প্রযোজিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞের মতে, পারসী থিয়েটার নাম পরিবর্তন করে মুনলাইট থিয়েটার নামে ১৯৬৯ সন পর্যন্ত চালু ছিল। পারসী থিয়েটারের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি বিশেষ পর্বে ভাগ করে নির্দিষ্ট নামকরণ করেছেন। এ সকল পর্বের মধ্যে প্রধান হল বেতার যুগ (১৮৮৬—১৯১৫)। পারসী থিয়েটারের প্রধানতম নাট্যকার ছিলেন আগা অশ্র কাশ্মীরা। ১৯০০ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পারসী থিয়েটারে প্রযোজিত হয়েছিল 'সফেদ খুন' 'সৈদে হবস্' 'শহীদে নাজ' প্রভৃতি নাটক। ১৯১০ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রযোজিত হয়েছিল 'খুবসুরত বলা' সিলবর কিং, ইহুদী কা লেড়কী, সুরদাস, বনদেবী, শামে জবানী প্রভৃতি নাটক। [মন্তব্য: পরবর্তী নাটকগুলোর কথা উল্লিখিত হল না, কেননা ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মোটামুটি এ সময় পর্যন্তই বঙ্গীয় নাট্যশালার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন।]

বেঙ্গল থিয়েটার: বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ। ইনি ছিলেন বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু) দৌহিত্র। শরৎচন্দ্র নিজে সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গদেশে বেঙ্গল থিয়েটারই সর্বপ্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অধিকারী হয়েছিল। এর পূর্ববর্তী ন্যাশনাল থিয়েটারের কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারে সর্বপ্রথম স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্য স্ত্রী অভিনেত্রী নেওয়া হয়। এলোকেশী, গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত), জগত্তারিনী ও শ্যামা এ চারজন অভিনেত্রী মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের অনুরোধেই মধুসূদন বহু বছর পরে আবার

দুটি নাটক লিখতে স্থরু করেছিলেন এদের মধ্যে মায়াকানন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। অপর নাটক 'বিষ না ধমুর্গুণ' সম্ভবত সমাপ্ত হয় নি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঙ্গল থিয়েটারে শতাধিক নাটক অভিনীত হয়েছিল। অবশ্য ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার নাম প্রাপ্ত হয়। প্রিনস আলবার্ট ভিক্টরের সম্বর্ধনার জন্য বেঙ্গল থিয়েটার গড়ের মাঠে 'শকুন্তলা' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে উক্ত নাম লাভ করে ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের পাকা বাড়ী তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অমৃতলাল বস্থ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী বস্থ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ (গ্যাদাড়ু), ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র চন্দ্র বস্থ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বস্থ, শরৎচন্দ্র ঘোষ, এলোকেশী, কাদম্বিনী, গোলাপ, জগত্তারিনী, বনবিহারিনী, বিনোদিনী, যাত্নমনি প্রভৃতি আরও অনেকে।

মিনার্ভা থিয়েটার: মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মিনার্ভা থিয়েটার খুলেছিলেন। এ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন নাগেন্দ্র ভূষণ। ২৮ জানুয়ারী ১৮৯৩ সন গিরিশচন্দ্র অনূদিত ম্যাকবেথ নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে মিনার্ভার উদ্বোধন হয়। অতঃপর নানা পরিবর্তন ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিনার্ভা থিয়েটার এখনও জীবিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় পঁচাত্তরটি নাটক এখানে অভিনীত হয়। এ কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী ছিলেন নাগেন্দ্র ভূষণ, শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্র সরকার, অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, চুনিলাল দেব প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে মিনার্ভার সঙ্গে অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন অঘোরনাথ পাঠক, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, কুমুদ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তারক পালিত, মনোমোহন গোস্বামী, স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), কিরণবালা, কুস্থমকুমারী, তারাস্থন্দরী, তিনকড়ি দাসী, বিষাদ কুস্থম, সরোজিনী প্রভৃতি আরও অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

ষ্টার থিয়েটার: ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মূলে অভিনেত্রী বিনোদিনীর ত্যাগ স্বীকার ইতিহাস হয়ে আছে। ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন গুর্মুখ রায়। তাঁর ইচ্ছা ছিল থিয়েটারের নাম হবে 'বি-থিয়েটার'—বিনোদিনীর নামে। কিন্তু বিনোদিনীর কিছু সহকর্মীর চক্রান্তে তা সম্ভব হয় নি। ষ্টার থিয়েটারের বিভিন্ন ভার ছিল যথাক্রমে—অধ্যক্ষ ও শিক্ষক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ষ্টেজ ম্যানেজার—অমৃতলাল বসু, সহকারী ষ্টেজ ম্যানেজার—দাসুচরণ নিয়োগী, সঙ্গীত শিক্ষক—বেনীমাধব অধিকারী এবং কোষাধ্যক্ষ—হরিপ্রসাদ বসু। বিডন স্ট্রীটে এ থিয়েটার অবস্থিত ছিল। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৭ সনের মধ্যে ষ্টার থিয়েটারে প্রায় সতেরো খানি নাটক অভিনীত হয়। এরপর বিডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটার উঠে যায়। স্থাপিত হয় হাতিবাগানের ষ্টার থিয়েটার। এই ষ্টার থিয়েটার মূলত অভিনেতাদের উদ্যোগে এবং গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু উত্থান পতন ও হাতবদলের পরেও হাতিবাগানের ষ্টার থিয়েটার এখনো টিঁকে আছে। ১৮৮৭ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ষ্টার থিয়েটারে প্রায় সত্তরখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে এ মঞ্চের সঙ্গে অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন অঘোরনাথ পাঠক, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নীলমাধব চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, কিরণবালা, গঙ্গামণি, তারাসুন্দরী, প্রমদাসুন্দরী, বনবিহারিনী, বিনোদিনী, বিষাদকুসুম, ভূষণ কুমারী প্রভৃতি আরও অনেকে।

প্রসঙ্গ : অভিনেতা অভিনেত্রী

বর্তমান গ্রন্থে প্রসঙ্গত যে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম উল্লিখিত হয়েছে এখানে তার একটি তালিকা দেওয়া হল :

অটলবিহারী সেন
অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
অনুকুল বটব্যাল
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অমৃতলাল বসু
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
অহীন্দ্রনাথ দে
উপেন্দ্রনাথ মিত্র
কার্তিকচন্দ্র দে
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
ক্ষেত্রনাথ মিত্র
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী
ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়
তারকনাথ পালিত
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
নগেন্দ্রনাথ বসু
নিখিলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব
নীলমণি ঘোষ
নৃপেন্দ্রনাথ বসু
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
প্রিয়নাথ ঘোষ
মতিলাল সুর
মনোমোহন গোস্বামী
মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল
মহেন্দ্রলাল বসু
মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্যামাচরণ কুণ্ডু
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
হীরালাল চক্রবর্তী
এলোকেশী
কিরণ
ক্ষেত্রমণি

গঙ্গামণি
চপলা
ছোটরাণী
তারাসুন্দরী
প্রকাশমণি
প্রমদা
বনবিহারিনী
বিনোদিনী
ভবতারিনী
ভূষণ কুমারী
সরোজিনী
সুকুমারী দত্ত
সুশীলা বালা
হেনা

আলোচনা—এক

নাট্যসাহিত্যের সমালোচনায় ধনঞ্জয়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'

ধনঞ্জয়বাবুর বইটির লক্ষ্য সমকালের থিয়েটারের সামগ্রিক মূল্যায়ন। প্রয়োগের দৃষ্টিকোন থেকেই গোটা ব্যাপারটা তিনি দেখতে চেয়েছেন। সাহিত্য-হিসেবে নাটকের বিচার তারই অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে এসেছে। রীতিমত নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনা করতে তিনি বসেন নি। কিন্তু প্রয়োগের উপাদান হিসেবে 'পুস্তক নির্বাচন' শীর্ষক অধ্যায়টি প্রথমেই সংযোজিত। এই সূত্রেই সমকালীন নাটকের গুণদোষাদি বিষয়ে সমালোচনায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। তার আগে 'অবতরণিকা' অংশেও কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্থান পেয়েছে।

'অবতরণিকা'য় বাংলা নাটকের পুরানো ইতিহাস বিষয়ে যে দু চারটি তথ্য আছে তাতে সঙ্গত কারণেই কিছু ভ্রান্তি-ত্রুটি-অপূর্ণতা আছে। অনেক কথা পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হ'ল লেখকের দুটি অভ্রান্ত পর্যবেক্ষণ —

> ১. নাট্যশালার বিকাশের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের উন্নতি জড়িত। নাটকীয় রুচি নাট্যশালাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে দেশে সে-রুচি অমার্জিত সেখানে নাট্যসাহিত্যের দুর্দশা ঘটতে বাধ্য। বাংলা নাটক প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক একথা প্রমাণও করেছেন।
>
> ২. বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে 'নাটক' অংশটির তুলনা-মূলক অতি দুর্বলতা। 'যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেরই মতে বর্তমান বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের আলোচনা একটু বিশেষ-ভাবে কড়া হাতে করা আবশ্যক হইতেছে ; কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অংশে আবর্জনার পরিমাণ বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে।'

বাংলা মঞ্চের সংখ্যাবৃদ্ধি, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা, নিয়মিত অভিনয়, নতুনত্বসৃষ্টির তাগিদ এই সব মিলে নাটকরচনার প্রাচুর্য

ঘটিয়েছে এই কালসীমায়। জনমনে প্রভাব বেড়েছে তার। যার জন্য সাহিত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক বাংলা নাট্যধারায় একে গৌরবের কাল বলে অভিহিত করেছেন। দেখা যাচ্ছে সমকালীন লেখক ধনঞ্জয় এ-বিষয়ে মোহমুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক নাটক এই পর্বে লেখা হয়েছে এবং তার অনেকগুলিকেই আবর্জনা বলে ধিক্কার দিয়েছেন ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

'পুস্তক নির্বাচন'-এর আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দর্শক-রুচির দোহাই পাঁরার প্রবণতাকে একেবারে নস্যাৎ করেছেন। দর্শকদের রুচি নাট্যশালা ও নাট্যকারেরা মিলে তৈরি করে থাকেন। তাই বদলাতেও পারেন। কিন্তু সে চেষ্টা দূরের কথা, মঞ্চ সংশ্লিষ্ট নাট্যকারেরাই ক্রমিক চেষ্টায় সেই রুচিকে অমার্জিত স্থূল ও লঘু করে তুলেছেন।

এই সময়ের নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ধনঞ্জয়বাবুর বক্তব্যের সার—

১. অতি মাত্রায় অনুকরণ প্রবণতা। কোনো নাটকের কোনো প্রসঙ্গ চরিত্রপরিকল্পনা, কোনো ঢঙের দৃশ্যবিশেষ জনপ্রিয় হ'লে বা জনপ্রিয় হয়েছে বলে নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষ মনে করলে তার অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি।

২. নিম্ন রুচির সংলাপ, আচরণ, গানের সংযোজন ঘটিয়ে বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন-সাধন।

৩. নাটকে নৃত্যগীতের বাহুল্য। প্রসঙ্গের সঙ্গে, রসের সঙ্গে কোনো যোগ বা সঙ্গতি আছে কিনা সে বিষয়ে চিন্তামাত্র না করা।

৪. ভাব গম্ভীর রচনা ও গাঢ় নাট্য রসের প্রতি অনাগ্রহ। এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যাল্পতা।

৫. শুধু 'মজা' করার উদ্দেশ্যে চরিত্রপরিকল্পনায় স্বাভাবিকতা ও সঙ্গতি বর্জন। শুধু দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য অবান্তর দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ যোজনা।

৬. রচনায় বিপরীত রসের সমাবেশ ঘটানো। লেখকের ভাষায় 'সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের রসবিচার-স্থলে লিখিত আছে, করুণ রসের বিরোধী হাস্যরস, আর শান্ত রসের বিরোধী ভয়ানক রস। এখনকার নাটককারেরা একথাটার প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখেন না।… কাব্যের আস্থায়ী রসের সহিত সঞ্চারী রসের বিরোধ না ঘটে, ইহাই নির্দেশ করা অলঙ্কার-শাস্ত্রের ঐ বিধানের ফলিতার্থ।'

৭. রিলিফের নাম করে গম্ভীর ভাবের ক্রমরক্ষা না করার অতি-প্রকট প্রবণতা।

হাস্যরসের বাড়াবাড়ি নিয়ে লেখকের তীব্র মন্তব্য সমকালের নাটকে প্রকাশিত অতি স্থূল, অপ্রয়োজনীয়, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হাস্যর কথা মনে রেখেই বুঝতে হবে।

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের এই বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, সেকালের নাটকের মুখ্য ব্যাধি গুলিকে যথাযথ নির্দেশ করেছে।

প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের কথাই সব চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। গিরিশবাবুর নাটক সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত প্রায় সব ত্রুটিগুলির কথা তীব্রভাবে লেখক উদাহরণ সহ দেখিয়েছেন। এমন কি এর অনেকগুলি দোষাবহ প্রবণতার উৎসরূপে সমকালীন নাটক ও মঞ্চের সর্বাধিক প্রভাবশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে তিনি দায়ীও করেছেন। তাঁর 'পূর্ণচন্দ্র,' 'জনা' 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'হারানিধি', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটক থেকে এই বক্তব্যের সমর্থক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যদিও 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' 'হারানিধি'কে তিনি ঘটনা বৈচিত্র্যে পূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী বলেছেন, 'সিরাজউদ্দৌলা'-'বলিদান'-প্রফুল্ল'কে বলেছেন মনোজ্ঞ নাটক, সিরাজউদ্দৌলাকে আর একবার বলেছেন উচ্চাঙ্গের নাটক, কিন্তু এদের মধ্যেও অতি মাত্রার গ্রাম্যকল্পনা, অকারণ অনুকরণপ্রিয়তা, স্থূল রুচির সঙ্গীত সমাবেশ, অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যযোজনা, চরিত্র-সঙ্গতির অভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করেছেন। দীনবন্ধুর ব্যর্থ অনুকরণের জন্য গিরিশচন্দ্রকে তিনি নিন্দা করেছেন।

দেখা যায় লেখক এই সব নাটকের ক্ষেত্রে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ভাবগাঢ় নাটকের একান্ত অভাবের মধ্যে এদের আংশিক গাম্ভীর্য তাঁকে উৎসাহী করে থাকবে। আর একথাও মেনে নিতে হয় আধুনিক কালেও তীক্ষ্ণধী পাঠক বলবেন সিরাজদ্দৌলা-প্রফুল্লতেই মাত্র গিরিশচন্দ্র বহুতর ত্রুটি সত্ত্বেও স্বল্প সাফল্য লাভ করেছিলেন। ধনঞ্জয় বাবু জনা পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তিমূলক নাটক সম্বন্ধে আগ্রহ দেখান নি। অথচ এদের জনপ্রিয়তা সেকালে ছিল তুঙ্গে, একালেও ভক্তিব্যাকুল সমালোচক এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যুক্তিবোধনাশী, উচ্ছ্বাসতরল, মধ্যযুগসুলভ ভক্তিরস বাংলা নাটকের যতটা ক্ষতি করেছিল এবং যতটা স্তুতিলাভ করেছিল এমন আর কিছু নয়। এই ঢেউয়ের উপরে ধনঞ্জয়ের বিচারবুদ্ধি মাথা তুলে রাখতে পেরেছিল এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

—ক্ষেত্র গুপ্ত

আলোচনা—দুই

নাট্য প্রয়োগ বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'

'বঙ্গীয় নাট্যশালা' গ্রন্থে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যেসব নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের অভিনয় হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অবশ্য প্রসঙ্গত ১৮৭৪-য়ের পূর্ববর্তী কিছু নাটক ও নাট্য-প্রযোজনা নিয়ে ইতস্তত মন্তব্যও রয়েছে। কিন্তু লেখক প্রধানতঃ সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হবার পর থেকে যে নাটকগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তাদের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এর মধ্যেও আবার নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব কাল থেকে বিশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত অভিনীত নাটকগুলো মনোযোগ পেয়েছে বেশী।

সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হবার ফলে নাটক রচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে কিছু গুণগত পরিবর্তন এসেছিল। লেখক সে বিষয়ে সচেতন থেকে নাট্য প্রযোজনার একটি সামগ্রিক চেহারা ধরতে চেয়েছিলেন। আলোচ্য যুগটি নানা কারণে নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। গিরিশচন্দ্র এযুগের অবিসংবাদী অধিনায়ক। শ্রেষ্ঠতম বাঙালী নাট্যকার ও অভিনেতার মর্যাদা তিনি পেয়েছিলেন। তাই এযুগের নাট্য প্রযোজনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক স্বভাবতই গিরিশচন্দ্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচাইতে বেশী। কাজেই এযুগের নাট্য প্রযোজনার একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বইটির গুরুত্ব রয়েছে।

নাট্য প্রযোজনার প্রধান উপাদান হিসেবে লেখক চারটি বিষয়কে নির্দেশ করেছেন—'পুস্তক নির্বাচন, অভিনয় শিক্ষা, পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদি'। অবশ্য 'অন্যান্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়'-ও তিনি ভোলেন নি। এগুলো হল নাচ, গান, অভিনেতৃবর্গ, অভিনয়ের সময়, দর্শক ও সমালোচক। এসব বিষয় নিয়েও যথাযোগ্য আলোচনা হয়েছে।

এখানে একটি কথা মনে রাখা যেতে পারে। নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে আমাদের দেশে বর্তমানে যে ধারণা রয়েছে, গিরিশযুগে তা ছিল না। নাট্য প্রযোজনায় পরিচালক বা প্রয়োগকর্তার ভূমিকা এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার গুরুত্ব আজকাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এধরনের প্রয়োগকর্তা ও

পরিকল্পনা গিরিশযুগে ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না। কেন না নাট্য প্রযোজনায় প্রয়োগ কর্তার প্রয়োজনীয়তার কথা ইয়োরোপেও স্বীকৃত হতে সুরু করেছে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে। বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়ে এ বিষয়গুলো মনোযোগ পেয়েছে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সময় থেকে। বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমারই প্রথম প্রয়োগকর্তা। অবশ্য নাট্য প্রযোজনায় প্রয়োগ কর্তার গুরুত্ব আচার্য ভরতের 'নাটশাস্ত্রে' উল্লিখিত হয়েছে। ভরতমুনি প্রয়োগ কর্তার বিবিধ গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ নিয়েও অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন [নাট্যশাস্ত্র ৩৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

গিরিশযুগে প্রযোজনার ভার নিতেন একজন নাট্য শিক্ষক। তিনি মূলতঃ অভিনয়ের মহলায় তত্ত্বাবধান করতেন। নাট্য প্রযোজনার অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি ততটা মাথা ঘামাতেন না। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, নাচ-গান প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লক্ষ্য রাখতেন। অবশ্য তাঁরা হয়ত প্রয়োজনে নাট্য শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করতেন, কিন্তু মূলত তারা মঞ্চের স্বত্বাধিকারীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। কতটা পয়সা খরচ করা হবে, দর্শকরা কি চান—কত পয়সা উশুল হবে—প্রধানত এ সব চিন্তাই নাটক মঞ্চস্থ করার সময় করা হত।

এসব কারণে স্বভাবতই নাট্য প্রযোজনায় অভিনয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত বেশী। আমাদের আলোচ্য পর্ব সর্বাংশে অভিনয়ের যুগ। এ যুগে যত বড় বড় অভিনেতা একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, সম্ভবত পরবর্তী কোন যুগে তেমন আর ঘটে নি। প্রযোজনায় অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ কর্তাদের সচেতনতা বেড়েছে পরবর্তীকালে। সাম্প্রতিককালের নাট্য প্রযোজনায় অভিনয় একটি আবশ্যকীয় উপাদান, প্রধানতম নয়।

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে বোঝা যায়, অভিনয়ের দিকে বেশী নজর দিতে গিয়ে নাট্য প্রযোজনার অন্যান্য বিষয়গুলো কিভাবে অবহেলিত হত। ফলে সামগ্রিকভাবে প্রযোজনাও দুর্বল হয়ে অভিনয়কে প্রত্যাঘাত করত। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হত রঙ্গালয়।

আলোচ্য পর্বে নাট্যজগতের প্রধান পুরুষ হিসেবে গিরিশচন্দ্রকে সবচাইতে বেশী সমালোচনা করেছেন লেখক। নাট্য শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অর্ধেন্দু শেখরের তুলনায় গিরিশচন্দ্র তত পারদর্শী ছিলেন না, একথা তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যদি অর্ধেন্দু পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফীর ছদ্ম নাম হয় তাহলে এ বিশ্লেষণ পক্ষপাত দুষ্ট মনে হতে পারে। কিন্তু লেখকের মন্তব্য অসমীচিন নয়। কেন না সমকালীন অন্যান্য কিছু প্রখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে অর্ধেন্দুশেখরকেই শ্রেষ্ঠতর নাট্যশিক্ষক বলে নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী দাসী ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণ করা যেতে পায়। তাছাড়া, father of native stage হিসেবে গিরিশচন্দ্রই রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষের জন্য মূলত দায়ী হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

সাধারণ রঙ্গালয়ের সৌভাগ্য, তার সঙ্গে জড়িত কিছু অভিনেতা অভিনেত্রী উত্তরকালে কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন। এ সব লেখার মাধ্যমে লেখকদের সমকালীন নাট্যজগৎ সম্পর্কে বহু বিষয় জানা যায়। কিন্তু লেখাগুলো বিবৃতি মূলক হওয়ায় প্রধানত বিশেষ বিশেষ ঘটনা গুরুত্ব পেয়েছে। নাট্য প্রযোজনার সামগ্রিক চেহারা তাতে ততটা পরিষ্কার ফুটে ওঠে নি। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা সে অভাব মোচন করেছে। সে হিসেবে 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' স্মৃতিচারণ মূলক রচনাগুলোর পরিপূরক বলে গণ্য হতে পারে।

নাট্য প্রয়োগ-বিজ্ঞান বিষয় খুব বেশী বই বাঙলায় লেখা হয়নি। যা-ও বা হয়েছে প্রায় সবই সাম্প্রতিক কালে। প্রয়োগ কলাকে সুষ্ঠু করতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে আধুনিক তাত্ত্বিকেরা ওয়াকিবহাল। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গীয় নাট্যশালা' প্রয়োগ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়। তা সত্ত্বেও প্রয়োগকলার প্রধান উপাদান নিয়ে বাঙলায় আলোচনার সূত্র-পাত হয়েছে এই গ্রন্থে। এর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ বিজ্ঞানের কিছু সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা যেতে পারে। সে সূত্রগুলো আধুনিক তাত্ত্বিকদের কাছেও সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে সন্দেহ নেই।

—বিষ্ণু বসু